যদি জানতেম

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক—

শ্রীবিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড

৪৬/৫ বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

পরিবেশক—

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—

শ্রীসুকুমার চৌধুরী

বাণী-শ্রী প্রেস

৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

শ্রীসমীরকুমার রায়চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণে—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—

দীননাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

চার টাকা

নিবেদন

কিছুদিন পূর্বে 'গল্প-ভারতী' মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় লেখকের 'মানব-সমিতি' প্রকাশিত হয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল, কিন্তু উপন্যাসটি সুন্দরতর করবার মানসে তিনি পরে সেটিতে পুনরায় হাত দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করার কিছুকাল আগে কাহিনীর প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত করেন এবং 'মানব-সমিতি'র পরিবর্তে উপন্যাসটির নতুন নাম 'যদি জানতেম' রাখেন।

পুস্তকাকারে 'যদি জানতেম' উপন্যাসের এই প্রথম প্রকাশ। সর্বদেশের ও সর্বকালের পাঠকমণ্ডলীর হাতে স্বর্গত কথা-সাহিত্যিকের এই অমর সৃষ্টিখানি তুলে দিয়ে আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করছি।

এই লেখকের বই

রাজপথ	৭ম সংস্করণ
ছদ্মবেশী	৫ম "
অমূল তরু	৪র্থ "
দিকশূল	৪র্থ "
বিদুষী ভার্যা	৪র্থ "
অভিজ্ঞান	৪র্থ "
শশিনাথ	৪র্থ "
আশাবরী	৩য় "
অন্তরাগ	৩য় "
যৌতুক	৩য় "
অমলা	৩য় "
সোনালী রঙ	২য় "
একই বৃন্ত	২য় "
কন্যামৃগয়া	২য় "
মাটির পথ	
যদি জানতেম	
রাতজাগা	২য় সংস্করণ
শ্রেষ্ঠ গল্প	
নাস্তিক	
সাত দিন	
গিরিকা	
নবগ্রহ	
কমিউনিস্ট্ প্রিয়া	
বেলকুঁড়ি	
স্মৃতিকথা ১ম ও ২য় পর্ব	২য় সংস্করণ
স্মৃতিকথা ৩য়, ৪র্থ পর্ব	
মায়াবতী পথে	
শেষ বৈঠক	
বিগত দিন	
রাজপথ	(নাটক)
ভারত-মঙ্গল	"
উট রোগ	"

যদি জানতেম

এক

খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট হইতে মাইল পাঁচেক পূর্বে মধুমতী নদীর সহিত ভৈরব মিলিত হইয়াছে। তৎপরে এই দুই নদ এবং নদীর সংযুক্ত জলরাশি স্ফীত আকার ধারণ করিয়া যে বিস্তৃত প্রবাহে দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহার নাম বলেশ্বর; এবং এই বলেশ্বর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় নামপরিবর্তনপূর্বক হরিণঘাটা নদী নামে বঙ্গোপসাগরে গিয়া মিশিয়াছে।

ভৈরব এবং মধুমতীর সঙ্গমস্থল হইতে কিছু দক্ষিণে বলেশ্বরের দক্ষিণ উপকূলে ঝিঙ্গুরখোলা গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া যে কাঁচা পথ সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা ধরিয়া ক্রোশ দুয়েক অগ্রসর হইলে ইসমাইলপুরে উপনীত হওয়া যায়।

ইসমাইলপুরের মহাপরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন খাঁ বাহাদুর আলি আহমদ সাহেব,—কিছুদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আলি আহমদের দুই পুত্র, কবির আহমদ ও সুলতান আহমদ। কবির আহমদ কলিকাতায় হস্টেলে থাকিয়া বি. এ. পড়িত; কিন্তু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে, জীবনের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে কোনো কারণে হয়ত সেই সংশয়ের বশীভূত হইয়া, আলি আহমদ জমিদারিতন্ত্রের কয়েকটি মূলমন্ত্র শিখাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কবিরকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন।

অন্ততঃ বি. এ. পাস করিবার পূর্বে যাহাতে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে না হয় সেজন্য কবির পিতাকে একবার অনুরোধ করিয়াছিল। আলি আহমদ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তা হ'লে হয়ত দেরি হয়ে যাবে কবির! দেরি হয়ে গেলে তখন

আর জাত-জমিদার হতে পারবে না; তখন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে।'

তদুত্তরে কবির বলিয়াছিল, 'বেশ ত বাবা, সুলতান ত আপনার কাছে-কাছেই থাকে, তাকে আপনি তালিম দিন।'

উত্তরে আলি আহমদ বলিয়াছিলেন, 'সুলতানকে তালিম দিলেও সে কখনো জাত-জমিদার হতে পারবে না, হেলে-জমিদারই হবে। ছেলেরা যেমন হেলে-সাপকে নিয়ে নির্ভয়ে খেলা করে, প্রজারা তেমনি সুলতানকে নিয়ে খেলা করবে। ছবি আঁকা আর পদ্য লেখার নেশায় যে সর্বদা মশগুল, তার দ্বারা জমিদারি পরিচালনা কোনদিন হবে না। লাঠি আর তুলি একসঙ্গে চলে না। তোমার মধ্যে অল্প-স্বল্প যেটুকু লক্ষণ দেখেছি তাতে মনে হয়, তালিম পেলে তুমি একদিন আমার স্থান অধিকার করতে পারবে।'

ইসমাইলপুরের প্রজারা কিন্তু বলে, চব্বিশ বৎসর বয়সেই যুবক কবির আহমদ তাহার বৃদ্ধ পিতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাহাদের মতে আলি আহমদ ছিলেন পরাক্রান্ত, কবির আহমদ দুর্দান্ত। আলি আহমদের প্রতাপে যে বাঘে এবং ছাগলে পাশাপাশি ঘাটে জলপান করিত, কবির আহমদের প্রতাপে তাহারা এক ঘাটেই পান করে। পিতার নিকট মাত্র ছয় মাস শিক্ষানবিসির পর পিতার মৃত্যু; তাহার পর আরও আড়াই বৎসর অতীত হইয়াছে। এই তিন বৎসরেই এতখানি উন্নতি!

যে সময়ের কথা বলিতেছি, ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজ্যশাসন তখন টলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; জমিদারি প্রথা কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বলবৎ আছে।

১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভ। কলিকাতার প্রয়োজনীয় কার্য সারিয়া দেশে ফিরিতে কবির আহমদের বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। আজ ইদলফেতর। এই পর্বটি কবির সমস্ত অন্তরের সহিত পালন করে, এবং ইহার জন্য ইসমাইলপুরের

জমিদারগৃহে প্রচুর আয়োজন হয়। শুধু অধুনাই নহে, সুচিরকাল হইতে ইদলফেতরের উৎসব ইসমাইলপুরের জমিদারভবনে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বেলা তখন সাড়ে চারটা, অল্পক্ষণ পরেই সূর্যাস্ত হইবে। বাগেরহাটের নৌকা-ঘাটে কবির সবেমাত্র তার ক্ষুদ্রকায় মোটর-লঞ্চে আরোহণ করিয়া বসিয়াছে এমন সময়ে দেখিল, অদূরে একটা নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল এবং তাহা হইতে অবতরণ করিল তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পূর্বতন সহপাঠী চিত্তনাথ মুখোপাধ্যায়।

চিত্তনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম শ্রেণীর নামজাদা ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে আরম্ভ করিয়া এম. এস-সি. পর্যন্ত সকল পরীক্ষাই সে সগৌরবে পাস করিয়াছে। গত তিন বৎসর যাবৎ সদা-সর্বদা তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না হইলেও এ কথা কবির অবগত ছিল যে, বিলাত গিয়া এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় জ্ঞান অর্জন করিয়া আসিবার চিরপোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে চিত্তনাথ বিচ্যুত হয় নাই, এমন কি সম্প্রতি সে বিলাত যাইবার ব্যবস্থা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে।

লঞ্চের ধারে উঠিয়া আসিয়া কবির উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল, "চিত্তনাথ!"

সবল কণ্ঠ হইতে নির্গত সেই গভীর উদাত্ত স্বরে জনাকীর্ণ নদীকূল চকিত হইয়া উঠিল। শুধু চিত্তনাথই নহে, চতুর্দিক হইতে আরও পাঁচ-সাত জন তাকাইয়া দেখিল।

কবিরকে দেখিতে পাইয়া ক্ষিপ্রপদে নিকটে আসিয়া প্রফুল্লমুখে চিত্তনাথ বলিল, "কি, কবির যে! কলকাতা গিয়েছিলে নাকি?"

কবির বলিল, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। উঠে এস।"

একটা নৌকার গায়ে লঞ্চটা লাগিয়াছিল, কবিরের ইঙ্গিত পাইয়া একজন খালাসী টানিয়া-লওয়া তক্তাখানা পুনরায় লাগাইয়া দিল।

চিত্তনাথ লঞ্চে আসিলে কবির দুই বাহু দিয়া তাহাকে নিজ বিস্তৃত বক্ষের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল; বলিল, "ভারি খুশী হলাম তোমাকে পেয়ে চিত্ত। আজ ঈদ, তোমাকেই প্রথম ঈদ মোবারক করলাম।"

সহাস্যমুখে চিত্তনাথ বলিল, "ঈদ মোবারক! হ্যাঁ, আজ ঈদ তা জানি। আমিও ভারি খুশী হলাম হঠাৎ তোমাকে এখানে পেয়ে। বাড়ি যাচ্ছ?"

কবির বলিল, "হ্যাঁ যাচ্ছি।" তারপর দুই হাত দিয়া সবলে চিত্তনাথের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধের কণ্ঠে বলিল, "তুমিও চল চিত্ত। কি আনন্দ যে হবে তুমি গেলে! ইসমাইলপুরের জমিদারবাড়ি আজ তোমাকে ঈদের সর্বপ্রধান অতিথি ব'লে গ্রহণ করবে।"

চিত্তনাথ বলিল, "আনন্দের সঙ্গে যেতাম ভাই; কিন্তু কিছুতেই হয় না, সময় একেবারেই নেই। পরশু বম্বে মেলে বিলেত যাচ্ছি। কি ক'রে হয় বল?"

কবির বলিল, "বিলেত যাচ্ছ, সে কথা এবার কলকাতায় গিয়ে শুনে এসেছি। কিন্তু এত শীঘ্র যাবে তা জানতাম না। পরশু বম্বে মেলে যাচ্ছ?"

"পরশু।"

একটু চিন্তা করিয়া কবির বলিল, "না, তা হ'লে আর হয় না।" তারপর লঞ্চের অগ্রভাগে সামনা-সামনি দুইটা চেয়ার রাখাইয়া চিত্তনাথের সহিত উপবেশন করিয়া বলিল, "এদিকে কোথায় এসেছিলে বল।"

চিত্তনাথ হাসিয়া বলিল, "তোমাদের দেশে, তোমার জমিদারিতে।"

ঈষৎ কৌতূহল সহকারে কবির বলিল, "আমার জমিদারিতে বললে ত বুঝতে পারব না কিছু। আমার জমিদারিতে কোথায়?"

"ঝিঙ্গুরখোলা গ্রামে। সেখানে ইসমাইলপুরের 'বড় মিঞা'র সুনাম শুনে দু কান ভ'রে গিয়েছে।" বলিয়া চিত্তনাথ হাসিতে লাগিল।

আলি আহমদের জীবদ্দশায় কবির আহমদের ডাকনাম ছিল বড় মিঞা এবং সুলতান আহমদের ছোট মিঞা। এখনও সাধারণতঃ তাহারা সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

চিত্তনাথের কথা শুনিয়া অতি ক্ষীণ হাস্যরেখায় কবিরের অধরপ্রান্ত কুঞ্চিত হইল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "সাধু ব্যক্তিদের ও-রকম সুনাম হয়েই থাকে,—ওর জন্যে তুমি কিছু মনে ক'রো না। তবু তারা কি বললে শুনি?"

"তারা বললে, ইসমাইলপুরের বড় মিঞা আর সুন্দরবনের বড় মিঞা দুই-ই এক গোত্রের জীব; তফাত এই মাত্র, ইসমাইলপুরের বড় মিঞা দু পায়ে হাঁটেন, আর সুন্দরবনের বড় মিঞা চার পায়ে। সুন্দরবনের লোকেরা বাঘকে যে বড় মিঞা বলে, এতদিন তা জানতাম না; এখানে এসে শিখলাম।"

পুনরায় কবিরের অধরপ্রান্ত মৃদু হাস্যে কুঞ্চিত হইল; বলিল, "ইসমাইলপুরের বড় মিঞার ল্যাজও তারা দেখেছে না-কি?"

চিত্তনাথ বলিল, "ল্যাজ পর্যন্ত যাবার দরকার হয় নি, শুধু দাঁত মিলিয়েই সিদ্ধান্ত করেছে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

চিত্তনাথের বাম স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া সহাস্যমুখে কবির বলিল, "কি করি বল ভাই, আমার অপরাধ কোথায় বল? তারা যদি নিজেদের নিতান্তই ছাগল ক'রে তোলে, আমার তা হ'লে নিজেকে বাঘ করা ছাড়া আর উপায় কি? তারা ছাগল ব'লে আমি ত আর সত্যি সত্যিই খাসি হতে পারি নে। বলি, সম্পর্ক ত শেষ পর্যন্ত খাদ্য-খাদকের। খাসি কোনদিন ছাগল খেয়েছে বলতে পার?"

সহাস্যমুখে চিত্তনাথ বলিল, "না, তা পারি নে। কিন্তু এ কথা

বলতে পারি, আজকের এই কচি ছাগলগুলির ক্রমশঃ একদিন রামছাগলে পরিণত হবার আশঙ্কা আছে। তখন আর তারা সুখাদ্য থাকবে না।"

"এখনো তারা সুখাদ্য নয়।"—বলিয়া কবির এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিতে লাগিল, "শোন চিত্ত, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, ইতিহাস তুমি কতটা পড়েছ জানি নে, কিন্তু এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, জগতের ইতিহাসে কোথাও কোনদিন রাজশক্তি দুর্বল হওয়ার ফলে প্রজাদের মঙ্গল হয় নি। রাজশক্তিকে খর্ব ক'রে প্রজারা নিজেদের অনিষ্টই করেছে।"

চিত্তনাথ বলিল, "এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্যও কবির, ইতিহাসেরও একটা বিজ্ঞানের দিক আছে।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কবির বলিল, "যে কথা রাজ্যের বিষয়ে সত্যি, সে কথা জমিদারির বিষয়েও সত্যি। জমিদারি রাজ্যের কণিকা সংস্করণ! কিন্তু সে কথা যাক, ঝিঙ্গুরখোলায় কার বাড়ি গিয়েছিলে?"

"হরিহর বাঁড়ুজ্জের বাড়ি।"

"কবে এসেছিলে?"

"আজকে।"

চিত্তনাথের কথা শুনিয়া শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া কবির চুপ করিয়া রহিল।

কবিরের ভঙ্গী দেখিয়া চিত্তনাথের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "কি বন্ধু, অমন ক'রে মুখ গম্ভীর করলে কেন? সেখানেও তোমার খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক আছে না-কি?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কবির বলিল, "সেখানেও যদি খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক থাকত তা হ'লে মুখ গম্ভীর না ক'রে মুখ-ব্যাদানই হয়ত করতাম। সেখানে আমার আঁচড়া-আঁচড়ির সম্পর্ক। এই ইসমাইলপুর-ঝিঙ্গুরখোলার তল্লাটে হাজার হাজার ছাগলের

মধ্যে ওই একমাত্র হরিহর বাঁড়ুজ্জের বাড়িতে একটি বাঘিনী আছে যাকে আমি ভয় করি, শ্রদ্ধাও করি।"

সকৌতুকে চিত্তনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে বাঘিনী কবির? কি তার নাম?"

চিত্তনাথের প্রশ্ন শুনিয়া কবির তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; বলিল, "কতক্ষণ তুমি বাঁড়ুজ্জে মশায়ের বাড়িতে ছিলে শুনি?"

"আজ সকাল থেকে বেলা আড়াইটে পর্যন্ত। ঘণ্টা আষ্টেক।"

"আধ ঘণ্টা সে বাড়িতে থাকলে যে বাঘিনীকে না-চিনে না-জেনে উপায় থাকে না, আট ঘণ্টা থেকে তুমি তাকে চিনতে পারলে না? আমাকে জিজ্ঞাসা করছ—কে সে বাঘিনী, কি তার নাম? প্রতিষ্ঠা তোমার কে হয় চিত্তনাথ?"

প্রশ্নের শেষোক্ত অংশের উত্তর আপাততঃ না দিয়া স্মিতমুখে চিত্তনাথ বলিল, "প্রতিষ্ঠাকে তুমি বাঘিনী বলছ কবির, আমার কিন্তু তাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ব'লে মনে হয়।"

কবির বলিল, "তোমাকে সে আলো দিয়েছে তাই তোমার তাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ব'লে মনে হয়, আমাকে সে ডাক দিয়েছে তাই আমি তাকে বাঘিনী ব'লে মনে করি।"

সবিস্ময়ে চিত্তনাথ বলিল, "প্রতিষ্ঠা তোমাকে ডাক দিয়েছে?"

কবির বলিল, "গভীর ডাক।"

"এরই মধ্যে?—এখনও ত ছ মাসও হয় নি কলকাতা থেকে দেশে বাস করতে এসেছে সে!"

সহাস্যমুখে কবির বলিল, "যে ডাক দিতে জানে, ছ মাস তার পক্ষে অল্প সময় নয় চিত্ত। তুমি যে তাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলছিলে, সে কথাও এমন-কিছু অন্যায় বল নি; অগ্নিস্ফুলিঙ্গও সে বটে। কলকাতা থেকে এসে আমাদের অঞ্চলটা শুধু নিজের প্রভা দিয়ে আলোকিতই করে নি, উত্তাপ দিয়ে গরমও ক'রে তুলেছে। আমার

ভয় হয়, উত্তাপটা আরও কিছু বাড়লে শেষ পর্যন্ত একটা অগ্নিকাণ্ড না ঘটে।”

“অর্থাৎ?”

“অর্থাৎ, এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যেটুকুও বা সদ্ভাব আছে তাও পুড়ে ছাই না হয়। প্রতিষ্ঠা ঝিঙ্গুরখোলায় এসেই কোমর বেঁধে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনে লেগেছে। সভা করছে, সমিতি করছে, হিন্দু-মুসলমানের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করছে, এমন কি অনেক সময়ে পুরুষদেরও সঙ্গে আলাপ করতে ছাড়ছে না; বলছে—তোমাদের দেশ এক, এক দেশের সন্তান তোমরা, তোমরা জাতি-ধর্ম ভুলে একত্র হও, এক হও।”

কবিরের কথা বোধহয় শেষ হইবার পূর্বেই চিত্তনাথ বলিল, “এ ত ভাল কথা কবির, এ ত অন্যায় কথা নয়।”

কবির বলিল, “অন্যায় কথা তা ত বলছি নে। কিন্তু কতক কতক মুসলমান এরই মধ্যে ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, এই মিলন-প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের হিন্দু ক'রে তোলা, অর্থাৎ হিন্দুভাবাপন্ন ক'রে তোলা। অপর পক্ষে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ত স্থির ক'রেই ফেলেছে যে, প্রতিষ্ঠার মুসলমানধর্ম গ্রহণ করতে আর খুব বেশি বিলম্ব নেই।” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কবিরের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিত্তনাথ বলিল, “দেশের মঙ্গল তা হ'লে সুদূরপরাহত কবির। জাতি-ধর্ম ভুলে একত্র হওয়ার তারা এই অর্থ করে না-কি?”

কবির বলিল, “জাতি-ধর্ম ভোলার কথা হিন্দুর কানে কি রকম লাগে তা তুমি বলতে পার, কিন্তু মুসলমানের কানে ভাল লাগে না। মুসলমান কোন-কিছুরই জন্যে ধর্মকে ভুলতে চায় না।”

চিত্তনাথ বলিল, “কিন্তু এ ত ধর্মকে ভোলা নয় কবির। তুমি

যা বলছ সে হচ্ছে মানুষের অন্তরের সামগ্র, আর এ হচ্ছে মানুষের বাইরের পরিচয়। আমার অন্তরের মধ্যে ধর্মের একটি কণাও না থাকতে পারে, তবুও ধর্মের পরিচয়ে আমি হিন্দু। জাতি-ধর্ম ভোলা মানে সেই বাইরের পরিচয়ের ধর্মকে ভোলা। তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু; কিন্তু তাই ব'লে কোনদিন কি আমাদের বন্ধুত্বে একটুও বেধেছে? ধর—"

চিত্তনাথের কথা শেষ হইয়াছে মনে করিয়া কবির উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখনও কিছু তাহার বলিতে বাকি আছে বুঝিয়া বলিল, "কি ধরব, বল?"

"ধর, এখন যদি লঞ্চের পিছন দিকে পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে তুমি নমাজ পড়, আর সামনের দিকে পূব মুখে ব'সে আমি আহ্নিক করি, তা হ'লে কি বলতে চাও, নিজ নিজ ধর্মকৃত্য শেষ ক'রে উঠে আমরা দুজনে হাতাহাতি লাঠালাঠি আরম্ভ করব?"

কবির বলিল, "নিশ্চয় করব না; আর একবার দুজনে দুজনকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরব।"

কবিরের এই মন্তব্যে দুই বন্ধুই যুগপৎ হাসিয়া উঠিল।

চিত্তনাথ বলিল, "তবে?"

"তবে কি?"

"তবে কেন হিন্দু-মুসলমানে মিলন হবে না?"

কবির বলিল, "কারণ, সব হিন্দুই তুমি নও, আর সব মুসলমানই আমি নই। উভয় সম্প্রদায়েই গুণ্ডা থেকে আরম্ভ ক'রে নেতারা পর্যন্ত আছে, সে কথা ভুলে যেয়ো না।"

কবিরের এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া দুঃখার্ত স্বরে চিত্তনাথ বলিল, "আচ্ছা কবির, কখনও কি আমাদের এক দেশ, এক জাতি, এক ভগবান হবে না ভাই?"

গম্ভীর মুখে কবির বলিল, "কেন হবে না, তোমরা সকলে যদি মুসলমান হও, তা হ'লে সহজেই ত হয়। এক দেশ ত আছেই,

জাতিও এক হবে, ভগবানও এক হবেন। আমাদের ত একই ভগবান। তোমাদেরই যে জটিল্ ব্যাপার, একেবারে তেত্রিশ কোটি।” বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

চিত্তনাথ বলিল, “ভগবান আমাদেরও একটিমাত্র কবির।—সেই একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ মহারাজাধিরাজ; তেত্রিশ কোটি দেবতা তাঁর সামন্তবর্গ, শ্রেষ্ঠ প্রজামণ্ডলী।”

উভয়ে নিজ নিজ চিন্তার মধ্যে ক্ষণকাল নিমগ্ন হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মৌনভঙ্গ করিল চিত্তনাথই; কহিল, “তুমি যাই বল কবির, হিন্দু-মুসলমান মিলন এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার ব'লে আমার মনে হয় না; আর সেই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে হিতে-বিপরীত হবে তাও ঠিক মনে করি নে। আজ সকালে প্রতিষ্ঠাদের বাড়িতে একটা ছোটখাট সভার মত বসেছিল। সেই সভায় হিন্দু বেশী ছিল কি মুসলমান বেশী ছিল গুনে না দেখলে বোঝবার উপায় ছিল না। আর সেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহ-উত্তেজনা কাদের বেশী ছিল তা বোঝবার মতো কোনও মাপকাঠিই ছিল না। তুমি কি বলতে চাও কবির, সেই সভায় যে-সব হিন্দু-মুসলমান এসেছিল তারা জাতি-ধর্ম ভুলে আসে নি?”

চিত্তনাথের সুদীর্ঘ বাক্য শুনিয়া কবির আহমদের ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু হাস্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া সে বলিল, “আমি বলতে চাই, অমন একটি উজ্জ্বল দীপশিখা যেখানে জ্বলে, সেখানে পতঙ্গের দল শুধু জাতি-ধর্ম ভুলেই আসে না, জীবন-মরণ ভুলেও আসে। প্রতিষ্ঠার প্রতি কোনও দিক দিয়ে বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করছি ব'লে তুমি ভুল ক'রো না। প্রতিষ্ঠার জ্যোতি নিষ্কলঙ্ক ব'লেই তার আকর্ষণী শক্তি এত বেশী।”

“প্রতিষ্ঠাকে তুমি দেখেছ?”

কবির বলিল, “মাত্র একদিন মাধবগঞ্জের সভায়। কিন্তু সেই একদিনেই তার দুটি দিক দেখতে পেয়েছিলাম;—একটি দিক

আলোর, অপরটি উত্তাপের। প্রতিষ্ঠার মত রূপসী মেয়ে জীবনে আমি আর একটি দেখি নি।"

কবিরের কথায় বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়া চিত্তনাথ বলিল, "প্রতিষ্ঠাকে তুমি এতই সুন্দরী মনে কর?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কবির বলিল, "তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে পার নি চিত্ত। প্রতিষ্ঠার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমি নিশ্চয়ই দেখেছি। আমি বলছিলাম, প্রতিষ্ঠার মতো রূপসী মেয়ে আমি আর-একটিও দেখি নি। সুন্দরী মেয়ে আমরা সর্বদা দেখতে পাই, কিন্তু রূপসী মেয়ে আমরা দেখি কদাচিৎ। সৌন্দর্য আর রূপ ঠিক এক জিনিস নয়। সৌন্দর্য যতটা দেহগত, রূপ ঠিক ততটাই দেহাতীত।' আশা করি, এবার আমাকে বুঝতে পেরেছ?"

চিত্তনাথ বলিল, "যদি বলি, 'না'—তা হ'লে তুমি আমাকে নির্বোধ ভাববে; কারণ এখনও আমার বিশ্বাস, এ পর্যন্ত আমি যতগুলি সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, ঠিক ততগুলিই রূপসী মেয়ে দেখেছি।"

মৃদু হাসিয়া কবির বলিল, "অর্থাৎ, প্রত্যেক সুন্দরী মেয়েকেই তুমি রূপসী মেয়েও মনে কর?"

অকুণ্ঠিত স্বরে চিত্তনাথ বলিল, "তা করি।"

"তা হ'লে বুঝতে হবে, সুন্দরী মেয়ে আর রূপসী মেয়ের যে প্রভেদটুকু অন্ততঃ আমি মনে মনে বুঝি, তা তোমাকে এখনও বোঝাতে পারি নি।"

তেমনি অকুণ্ঠিত স্বরে চিত্তনাথ বলিল, "না, তা পার নি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কবির বলিল, "আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি তা হ'লে বোধহয় বুঝতে পারবে। প্রতিষ্ঠাকে দেখে আমার কি মনে হয়েছিল জান?"

চিত্তনাথ বলিল, "রূপসী।"

দুই বন্ধুর উচ্চহাস্যে নদীতীর পুনরায় চকিত হইয়া উঠিল।

কবির বলিল, "তা ত মনে হয়েইছিল ;—আর সেইজন্যেই মনে হয়েছিল, প্রতিষ্ঠার দীপ্তির তলায় যদি বাছাই ক'রে কয়েকজন হিন্দু আর কয়েকজন মুসলমানকে একত্র করা যায় তা হ'লে এমন একটা এ (A) ক্লাস শক্তির ইউনিট্ তৈরী হয় যার দ্বারা মহাশক্তির বীজরূপে শুধু বাংলা দেশেরই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করা যায়। আমি তোমাকে হলফ নিয়ে বলতে পারি, কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখে এমন কথা আমার মনে হয় নি। সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা হয়ত খানিকটা রূপের পরিচয় পাই, কিন্তু রূপের দ্বারা আমরা স্বরূপের পরিচয় পাই। আশা করি এবার কতকটা বুঝেছ ?"

চিত্তনাথ বলিল, "এবারও বুঝি নি বললে তুমি আমাকে জলে ঠেলে ফেলে দেবে, অতএব কতকটা বুঝেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা এই বুঝেছি যে, তুমি যে মহাশক্তির বীজের কথা বলছ তার প্রাণবস্তু শুধু প্রতিষ্ঠা হ'লেই চলবে না, তোমাকেও হতে হবে।"

এ কথার উত্তরে কোনও কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া কবির কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

দুই

পশ্চিম গগনে গলিত সুবর্ণের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছিল। কৃষ্ণকায় তমিস্রা পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়া ধীরে ধীরে তাহার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া পশ্চিমের সেই সুবর্ণোৎসবকে বিনষ্ট করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এক ঝাঁক দিনচর পক্ষী সমীপবর্তী কোন জলাভূমিতে সমস্ত দিনমান কাটাইয়া সেই জ্বলন্ত পশ্চিম গগনের দিকে নিশীথ-আবাসের উদ্দেশে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের পূর্ণপ্রসারিত কম্পমান পক্ষে অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা পড়িয়া মুহুর্মুহু জ্বলিতেছে ও নিভিতেছে।

সহসা এক সময়ে যেন প্রগাঢ় স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া কবির বলিল, "প্রতিষ্ঠা তোমার কে হয় এখনও ত বললে না চিত্ত?"

মৃদু হাসিয়া চিত্তনাথ বলিল, "এখনও কেউ হয় না কবির।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কবির বলিল, "তা হ'লে বন্ধু-প্রিয়াই। আমিও কতকটা সেই রকমই অনুমান করছিলাম। কিন্তু বিয়ে ক'রে গেলে না কেন ভাই?"

চিত্তনাথ বলিল, "তুমি ত জান, প্রতিষ্ঠার দাদা অনিরুদ্ধ ইণ্টারণ্ড হয়ে আছে, এ দিকে আমারও অপেক্ষা করবার মতো তেমন সময় নেই।"

মৃদুস্বরে কবির বলিল, "তা হোক, নোঙরটা ফেলে গেলেই ভাল করতে।"

"ভেসে যেতে পারে ব'লে ভয় করছ?"

কবির বলিল, "একটুও যে করছি নে তা কি ক'রে বলি? একেবারে মহাসাগরের মোহনায় ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ, কোন্ দিকের হাওয়ায় কোথায় ভেসে যায় তা কে বলতে পারে? তা ছাড়া চিত্ত,

বিয়ে ক'রে তোমরা সুখী হও, খোদাতালার কাছে সর্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনাই করি, কিন্তু প্রতিষ্ঠার মতো মেয়েদের বিয়ে ক'রে সুখী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী নেই, সে চেতনাও তোমাকে করিয়ে দিতে চাই। এরা একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র টাইপ। এই বড় গণ্ডীর জীবেরা সংসারের ছোট গণ্ডীর কেউ নয়। বাইরের জগৎকে এরা যতটা চেনে সংসারকে তার কিছুই চেনে না। স্ত্রী হিসেবে এরা একেবারে আন্‌সাক্‌সেসফুল। এদের বিয়ে ক'রে সুখী হওয়ার চেয়ে এদের ভালবেসে দুঃখ পাওয়া ঢের সহজ। সংসার পরিত্যাগ ক'রে গিয়ে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে দুঃখ দিয়েছিল বটে, কিন্তু সংসারে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে যে বিশেষ সুখী করতে পারত তা মনে হয় না। কপালকুণ্ডলা আর প্রতিষ্ঠা অন্য দিক দিয়ে যাই হোক না কেন, সংসারের পক্ষে অনুপযুক্ততার দিক দিয়ে একান্তই এক টাইপ,—সংসারের মধ্যে এরা একেবারে মিস্‌ফিট। সমুদ্রকূল আর বালিয়াড়ির মধ্যে কপালকুণ্ডলাকে যেমন মানায়, প্রতিষ্ঠাকে ঠিক তেমনই মানায় সভা-সমিতির মধ্যে।"

ক্ষণকাল উভয়ে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; তাহার পর মৃদু কণ্ঠে চিত্তনাথ বলিল, "ঠিক তোমার মতো এমন ক'রে না ভাবলেও আমিও কতকটা এ সব কথা ভাবি কবির, কিন্তু চিন্তিত হই নে। আমি জানি, সন্ন্যাসিনীকে ভালবাসলে ঘরের মায়া করা চলে না। আর প্রতিষ্ঠা যে মনে-প্রাণে সন্ন্যাসিনী, সময়ে সময়ে তার পরিচয় পাই সংসারের প্রতি তার উৎকট নির্মমতা দেখে। এমন কি, এই বাঙলা দেশ, যাকে সে সত্যি-সত্যিই আত্মসমর্পণ করেছে, তাও সামান্য হয়ে যায় তার কাছে, যখন তার সামনে বিশ্ব এসে দাঁড়ায়। বাঙলার মেয়ের চেয়ে বিশ্বের মেয়ে সে ঢের বেশী। ঠিক সন্ন্যাসীরই মতো, সকলের ব'লে সে কারুরই নয়। প্রতিষ্ঠার মনে সন্ন্যাসীর অনন্যমুখিতা আছে তা আমি বেশ বুঝতে পারি কবির।"

মৃদু হাসিয়া কবির বলিল, "তা হ'লে এমন মেয়েকে, শুধু ভাল না বেসে, বিয়ে করবার সঙ্কল্প করলে কেন ?"

স্মিতমুখে চিত্তনাথ বলিল, "দুর্মতি ব'লেই যদি সেটা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় তা হ'লে দুঃখ ভোগ করতে হবে। কিন্তু তবুও তোমার প্রতি আমার একটা বিশেষ অনুরোধ রইল।"

"কি বল ?"

"আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এই মেয়েটিকে তোমায় রক্ষা করতে হবে। তুমি ভাই, আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দাও। এ অঞ্চলে তুমি অতিশয় প্রবল ; আর এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা মোটেই নিরাপদ নয়, তা বুঝে এসেছি।"

চিত্তনাথের কথা শুনিয়া কবির মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর এ কথা বুঝে আস নি যে, আমারও হাতে সে নিরাপদ নয় ?"

চিত্তনাথ বলিল, "হ্যাঁ, সে কথা প্রতিষ্ঠা নিজেই আমাকে বলেছে। এমন কি, একদিন তাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাবার সঙ্কল্পও তোমার মনে মনে হয়ত আছে, এমন সন্দেহও সে করে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

কবিরের অধরপ্রান্তে মুহূর্তের জন্য মৃদু হাস্য ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল। চিত্তনাথের প্রতি সকৌতূহল দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "এ কথা সে বলেছে ?"

"বলেছে।"

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কবির বলিল, "এত বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা কখনও মনে উদয় হয়েছে কি-না মনে পড়ছে না। কিন্তু আর সে কথা ভাবা চলবে না। বন্ধুপ্রিয়াকে হরণ করলে দুর্নামে দু কান বুজে যাবে। তারপর বিলেত থেকে ফিরে এসে সীতা-উদ্ধারের জন্যে তুমি একদিন ইসমাইলপুরে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল। তারপর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে, কোনোদিন হয়ত হরণ করতে হতেও পারে।

হরিহর বাঁড়ুজ্জের বাড়ি থেকে অবশ্য কোনোদিনই নয়,চালতাকাটির রতন চৌধুরীর কবল থেকে হয়ত কোনোদিন।"

"কবির!"

চিত্তনাথের চকিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্মিতমুখে কবির বলিল, "কি ?"

"প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এত খবর তুমি জান ?"

কবির বলিল, "ইসমাইলপুরে তুমি ত গেলে না, তা হ'লে দেখতে আমার আদম-খতিয়ানে কত বড় মান প্রতিষ্ঠার, আর কতখানি স্থান সে তাতে অধিকার করে। ষাট পাতা তার জন্যে ছাড়া আছে, তার মধ্যে পাতা দশেক লেখা হয়েছে, বাকি যেমন-যেমন প্রয়োজন হবে লেখা হবে। আজকের ঘটনায় আরও পাতাটাক ভরবে। একমাত্র প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কোনও লোকের জন্যে আদম-খতিয়ানে একুশ পাতাও ছাড়া নেই।"

"আদম-খতিয়ান ব্যাপারটা কি কবির ?"

কবির বলিল, "গভর্মেণ্টের কন্‌ফিডেন্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স বুক্ যেমন, এও কতকটা সেই রকম। জমিদারি সুপরিচালিত করবার জন্যে যে-সকল লোকের নাম-ধাম কার্য-কলাপ সর্বদা চোখের সামনে রাখা দরকার তাদেরই বিবরণ লেখা থাকে আদম-খতিয়ানে। আমার আদম-খতিয়ান আমি নিজে লিখি, আর থাকে আমার নিজের কাছে। কোনও কর্মচারীর চোখে কখনও তা পড়ে না। আমার আদম-খতিয়ানে প্রতিষ্ঠার বিবরণ তুমি যদি প'ড়ে দেখতে তা হ'লে বুঝতে পারতে, আমি যে তাকে একদিন হরণ করতে উদ্যত হতেও পারি, কি কারণে এই ধারণা তার মনের মধ্যে জন্মলাভ করেছে।"

কবিরের কথা শুনিয়া চিত্তনাথ হাসিতে লাগিল; বলিল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কবির, তোমার মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, কারণ আজকের মতো এমন ক'রে কোনোদিন

তোমাকে কৈফিয়ত দিতে শুনি নি। তোমার যদি দরকার থাকে ত ইসমাইলপুরে গিয়ে তোমার আদম-খতিয়ানে প্রতিষ্ঠার বিবরণ আর একবার পড়ে দেখো, আমার একটুও দরকার নেই। আমার শুধু দরকার তোমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যে, সব রকম বিপদে তুমি প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করবে।"

চিত্তনাথের প্রতি সুগভীর দৃষ্টিপাত করিয়া কবির বলিল, "যে প্রতিশ্রুতি তুমি চাচ্ছ তার সবটা দিতে পারলাম না চিত্ত, কিন্তু তবুও প্রায় সবটাই দিলাম। আমি ছাড়া আর সকল বিপদের হাত থেকে প্রতিষ্ঠাকে আমি সাধ্যমতো রক্ষা করব, এ প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলেও আমি তাকে রক্ষা করব, এ কথার কোনও অর্থ হয় না। আমার হাত থেকে প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করবার জন্যে তুমি খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাও, শুধু এই সুপরামর্শ আমি তোমাকে দিতে পারি।" বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

কবিরের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া চিত্তনাথ বলিল, "এই যথেষ্ট, এর বেশী আমি আর কিছু চাই নে। আর, তোমার হাত থেকে প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করবার জন্যে ভগবানের কাছে কোন অনাবশ্যক প্রার্থনা জানাবার দরকার আছে ব'লেও আমি মনে করি নে; কারণ এ আমি জানি যে, তোমার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধার ফলে তোমার হাত থেকে প্রতিষ্ঠা হয়ত দণ্ড পেতে পারে, কিন্তু অবিচার পাবে না।"

কবির বলিল, "বেশ, তা হ'লে প্রতিষ্ঠাকে একটা চিঠি লিখে দাও।"

"কি লিখব, বল ?"

"লিখে দাও, সকল অবস্থাতেই সে যেন আমার ওপর বিশ্বাস রেখে চলে।"

"এখনই। কাগজ কলম দাও।"

কবির উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল, "রহমৎ!"

দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া রহমৎ বলিল, "হুজুর!"

"কাগজ, লেফাফা, ফাউণ্টেন পেন,—জলদি।"

চিঠির কাগজের প্যাড, খাম ও কলম আনিয়া চিত্তনাথকে দিয়া রহমৎ নিকটবর্তী একটা বাতি জ্বালাইয়া দিল।

কবির বলিল, "সংক্ষেপে দুটি লাইনে লিখো,—বাজে কথা একেবারে লিখো না।"

কবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্তনাথ কহিল, "তোমার লঞ্চের নাম কি বল?"

কবির বলিল, "সি-ব্লু। কাগজের হেডিংয়ে ছাপা আছে।"

ইংরেজীতে ছাপা অংশ কাটিয়া দিয়া চিত্তনাথ লিখিতে আরম্ভ করিল।

সি-ব্লু মোটর লঞ্চ
বাগেরহাট, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৭

প্রিয়তমে প্রতিষ্ঠা,

মাত্র আড়াই ঘণ্টা তোমাকে ছেড়ে এসে এরই মধ্যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বাগেরহাট নদীঘাটে দৈবাৎ কবির আহমদের সঙ্গে দেখা। সে কলকাতা থেকে ইসমাইলপুরে ফিরছে। তারই মোটার লঞ্চে ব'সে তোমাকে চিঠি লিখছি।

তার সঙ্গে তোমার বিষয়ে অনেক কথা হ'ল। সে সব অত্যন্ত সুন্দর আর কৌতূহলজনক কথা পরে জাহাজ থেকে তোমাকে লিখে জানাব। আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখ, কবিরের দ্বারা কখনও তোমার অনিষ্ট হবে না। যদি কখনও কোনও রকম বিপদে পড়, অবিলম্বে তাকে জানিয়ো, সে তোমাকে সাহায্য করবে। সকল অবস্থাতেই তার উপর বিশ্বাস রেখে চ'লো। এমন কি, সে যদি কোনদিন তোমাকে হরণ ক'রেও নিয়ে যায়, তখনও নিশ্চয়

জেনো, সে তা তোমার মঙ্গলের জন্যই করেছে। এ কথার পর আর বোধ হয় বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

আমার অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ ক'রো। ইতি

একান্ত তোমার
চিত্তনাথ

খামের উপর প্রতিষ্ঠার নাম লিখিয়া চিঠি ও খাম কবিরের হাতে দিয়া চিত্তনাথ বলিল, "প'ড়ে দেখ।"

খামে ভরিবার জন্য চিঠিখানা ভাঁজ করিতে করিতে কবির বলিল, "যার চিঠি সে পড়বে। প্রণয়িনীকে চিঠি, চিঠির মধ্যে কত প্রেমনিবেদন আছে, আমি পড়তে যাব কেন?"

চিত্তনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "না না, এমন কিছু গুরুতর প্রেম-নিবেদন নেই। তুমি অনায়াসে পড়তে পার।"

কবির বলিল, "কিছু দরকার নেই চিত্ত, তুমি যা লিখেছ তার চেয়ে বেশী কিছু লেখা যায় না।"

"না প'ড়েই বলছ?"

"না প'ড়েই বলছি, কিন্তু না বুঝে বলছি নে।" বলিয়া কবির রহমৎকে ডাকিয়া চিঠিখানা আঠা দিয়া আঁটিয়া গালা দিয়া সীল করিয়া আনিবার জন্য দিল।

বিস্মিত হইয়া চিত্তনাথ বলিল, "এত সমারোহের সঙ্গে বন্ধ করবার কি দরকার কবির?"

কবির বলিল, "কতদিন আমার কাছে প'ড়ে থাকে বলা যায় না ত, একটু ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে রাখাই ভাল।"

"ও চিঠি তুমি উপস্থিত প্রতিষ্ঠাকে দেবে না না-কি?"

"দরকার না হ'লে কোনোদিনই দোব না,—কবিরাজদের বিষ-বড়ির মতো দুঃসময়ের জন্যে মজুদ থাকবে।" বলিয়া কবির মৃদু

হাস্য করিল। তারপর চিত্তনাথের দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "শোন চিত্ত, আমি তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমি সাধ্যমতো পালন করব, কিন্তু তোমাকেও একটা পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।"

সকৌতূহলে চিত্তনাথ বলিল, "কি বল ?"

"তোমার সঙ্গে আজ আমার এখানে এই যে দেখা হ'ল, আর এই যে-সমস্ত কথাবার্তা হ'ল, আর এই যে তুমি প্রতিষ্ঠার নামে আমাকে চিঠি দিলে,—এর বিন্দুবিসর্গও তুমি প্রতিষ্ঠাকে জানাবে না, যতদিন না আমি এ বিষয়ে তোমাকে আমার সম্মতি জানাই।"

কবিরের পাল্টা শর্তের কথা শুনিয়া বিস্মিত এবং কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া চিত্তনাথ বলিল, "কেন কবির ? তাতে কি এমন আপত্তি থাকতে পারে ?"

কবির বলিল, "পারে। আমার সঙ্গে চুক্তি ক'রে আমাকে তুমি তার বিপদের বন্ধু করেছ, এ কথা জানতে পারলে আমার প্রতি প্রতিষ্ঠার যে সহজ স্বাধীন মনোভাব আছে তা খর্ব করা হবে। বিশেষ কোনো ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত মনে করলেও অসঙ্কোচে সে করতে পারবে না। মানুষের মনের মধ্যে এই রকম কোনো একটা সঙ্কোচ ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে কাবু করা ভারি অন্যায় চিত্ত,—তা সে ভয় দেখিয়েই হোক, অথবা দয়া-দাক্ষিণ্যের জোরেই হোক।"

চিত্তনাথ জানিত, কবির যখন কোনো গুরুতর বিষয়ে একটা কথা বলে তখন সচিন্তিতার সহিতই বলে, এবং সে কথা হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা সহজ নহে। তাই আর তর্ক করিবার চেষ্টা না করিয়া সে সহজভাবে বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে না-হয় তোমার শর্তে রাজী হওয়াই গেল।"

কবির বলিল, "দুঃখ ক'রো না চিত্তনাথ, ভালই করলে। ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে হ'লে তার খুব কাছে যেতে নেই, একটু দূরে

থাকতে হয়, এ ত তুমি জান। অবন্ধু হয়ে যে-সব বিপদ থেকে আমি প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করতে পারব, বন্ধু হয়ে তার সকল থেকে পারব না। নিজের মন্দ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠাকে পুলিসের চক্ষে রাজদ্রোহিণীরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলেছে,—এ এ তুমি জান ?"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চিত্তনাথ বলিল "না, তা জানি নে। কিন্তু কবির, প্রতিষ্ঠার মধ্যে ত রাজদ্রোহিতার স্পর্শমাত্রও নেই ভাই,—শুধু কাজে-কর্মেই নেই তা নয়, মনে-প্রাণেও নেই। এমন কি, তার কথায়-বার্তায় যে-মাত্রায় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষহীনতা প্রকাশ পায়, তা মডারেটরাও সময়ে সময়ে পছন্দ করতে পারে না।"

মৃদু হাসিয়া কবির বলিল, "এ সত্য তুমি জান; আমি না জানলেও এখন না-হয় জানলাম; আর পুলিসকে জানাবার ভার যদি আমাকে নিতে হয়, তা হ'লে প্রতিষ্ঠার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে যত সহজে জানাতে পারব, প্রতিষ্ঠার পাশে দাঁড়িয়ে তত সহজে পারব না।"

চিত্তনাথ বলিল, "তা হ'লে দূরেই দাঁড়িয়ো।"

দুই বন্ধুর এই সুদীর্ঘ কথোপকথনের অবসরে কোনো এক সময়ে পশ্চিম গগন হইতে অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি-রেখা অপসৃত হইয়াছে। অল্প একটু স্থান অধিকার করিয়া ঈদের দ্বিতীয়ার চন্দ্রের অতি পাণ্ডুর ক্ষীণ আভাটুকু ব্যতীত এখন আর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। নদীবক্ষ হইতে উত্থিত পরিণত হেমন্তের গাঢ় কুহেলিকায় নদীর অপর পার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এবং এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে দেখিতে দেখিতে নদীতটভূমি ক্রমশঃ জনবিরল হইয়া আসিয়াছে।

চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিত্তনাথ বলিল, "চললাম কবির।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিত্তনাথকে আলিঙ্গন করিয়া কবির বলিল,

"এস, যদিও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। বিলেত থেকে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ো।"

চিত্তনাথ বলিল, "দোব। তুমিও দিয়ো।"

সে কথার কোনও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কবির বলিল, "রহমৎ, টর্চ দেখা।"

টর্চের উজ্জ্বল আলোকে পথ দেখিতে দেখিতে চিত্তনাথ সন্তর্পণে নামিয়া গেল।

ক্ষণকাল কবির তাহার দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর জুতা খুলিয়া মুখ-হাত-পা ধুইয়া নমাজ পড়িতে বসিল।

তিন

নদীবক্ষে হেড-লাইটের আলো ফেলিয়া ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে সি-ব্লু মোটার লঞ্চ দ্রুতগতিভরে ইসমাইলপুরের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে বামে সঞ্চরমাণ হেড-লাইটের উজ্জ্বল আলোকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া উভয় পার্শ্বের তীরভূমি স্পষ্ট দেখা না যাইলেও লঞ্চের নিরাপদ গতিপথ নির্ণয়ের পক্ষে তাহা অল্প নহে।

কয়েক দিন হইতে একটু চাপিয়া শীত পড়িয়াছে; তাহার উপর লঞ্চের দ্রুতগতিবশতঃ বায়ুর বেগবৃদ্ধিহেতু সেই শীত দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশী বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বিলাতী স্যুট্ পরিধান করিয়া কবির আহমদ ডেক্-চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে। মুখে একটা মোটা হ্যাভানা চুরুট পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে; অন্যমনস্কতার বিরতিকালে অল্পস্বল্প দুই-একটা টান দেওয়ার সময়ে মাঝে মাঝে তাহা ধূমোদ্গার করিতেছে।

কবির আহমদ চিন্তায় মগ্ন; কিন্তু সে অসংলগ্ন এলোমেলো চিন্তাবস্তুর না ছিল নির্দিষ্ট পরিধি, না ছিল সুস্পষ্ট কেন্দ্র। ক্যালিডোস্কোপে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহা ঘুরাইলে যেমন অফুরন্ত নূতন নূতন নক্শা' মুহুর্মুহু ফুটিয়া উঠে এবং মিলাইয়া যায়, ঠিক সেইরূপে কবিরের মানসপটে বহু বিচিত্র বিষয় এবং বিচিত্র ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বিবিধ গোত্রের এবং বিবিধ শ্রেণীর ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে যে আসিতেছিল ঘন ঘন এবং থাকিতে ছিল বেশী বেশী, সে প্রতিষ্ঠা।

অদ্ভুত মেয়ে এই প্রতিষ্ঠা। শুধু রূপেই সে অদ্ভুত নয়; কথায়-বার্তায় অদ্ভুত, চালে-চলনে অদ্ভুত। বর্তমানযুগের প্রগতিপরায়ণা

আধুনিক মেয়েদের চেয়েও সে আধুনিক। আধুনিক মেয়েরা যদি স্টীম এঞ্জিন, সে বৈদ্যুতিক এঞ্জিন। সে যখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহার মধ্যে বাষ্পের ফোঁসফোঁসানিও শুনা যায় না, কয়লার ধূমোদ্গারও দেখা যায় না; কিন্তু যখন চলে তখন তাহার গতি-বেগ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শক্তির এইরূপ নিঃশব্দ অথচ বেগবতী মূর্তি শুধু বর্তমানকালেই নহে, সর্বকালেই বিরল। শুধু একটিমাত্র দিনের সংঘর্ষেই কবির প্রতিষ্ঠার এই মূর্তি দেখিয়াছে। এরূপ মেয়ের সহিত সংঘর্ষে জিতিয়াও যত আনন্দ, হারিয়াও তত। হয়ত বা হারিয়াই বেশী।

তাই যে-সন্ধির দ্বারা এই জয় এবং পরাজয়-প্রসূত আনন্দ-লাভের পথ কায়েমীভাবে অবরুদ্ধ হইয়া যাইবার কথা, প্রতিষ্ঠার সহিত সেই সন্ধিস্থাপনার প্রস্তাব কবিরের ভাল লাগে নাই। তাও যদি সে সন্ধি প্রত্যক্ষ এবং পরস্পরের শক্তি-সামর্থ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে সুসমঞ্জস হইত ত স্বতন্ত্র কথা ছিল; তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায়, বন্ধুত্বের আবেদনে অর্জিত রূপরসহীন নিঃস্বত্ব সন্ধির মধ্যে মহিমাও নাই, মাধুর্যও নাই।

সহসা কবির তাহার চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া ডাকিল, "রহমৎ!"

দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া রহমৎ বলিল, "হুজুর!"

নদীর বাম তীর হইতে দক্ষিণ তীরে হেড-লাইটের আলোক ফিরিয়া আসিলে কবির বলিল, "ঐ যে দূরে ডান দিকে দু-চারখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে, ওটা ঝিঙ্গুরখোলার ঘাট না?"

এই জলপথের প্রত্যেক সুলুক-সন্ধান রহমতের নখদর্পণে আছে; মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করিয়া রহমৎ বলিল, "জি হুজুর, ঝিঙ্গুরখোলার ঘাটই বটে।"

"ওই ঘাটে লঞ্চ লাগাতে ব'লে দে।"

"ওখানে নাববেন নাকি হুজুর?"

"হ্যাঁ, নাবব। তুই গিয়ে ওসমানকে লাগাবার কথা বল্।"

লঞ্চ-চালকের নাম ওসমান আলি।

আদেশটা রহমতের মনঃপূত হইল না। পর্বের দিনে শীঘ্র ইসমাইলপুর পৌঁছিবার জন্য মনের মধ্যে একটা ব্যস্ততা ত ছিলই তাহার উপর রজনী দাসের ব্যাপার লইয়া ঝিঙ্গুরখোলার হিন্দু প্রজাদের মধ্যে সম্প্রতি যেরূপ উত্তেজনা জাগিয়া রহিয়াছে, তাহাতে রাত্রিকালে অরক্ষিতভাবে তথায় অবতরণ করা নিরাপদ বলিয়া তাহার মনে হইল না। সম্মুখসংগ্রামে একাকী কবিরের সহিত যুঝিয়া উঠে এমন কেহ হয়ত ঝিঙ্গুরখোলায় ছিল না; কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, আড়াল-আবডাল হইতে সহসা অতর্কিতে কে কি করিয়া বসে তাহার ত ঠিকানা নাই। রহমতের ইচ্ছা হইল, কবিরকে নিরস্ত করিবার জন্য একবার একটু চেষ্টা করিয়া দেখে। কিন্তু প্রভুর আদেশের সুরের সহিত তাহার পরিচয় ছিল; মনে হইল, অনুরোধে কোনও ফল ত হইবেই না, উপরোন্ত বিরক্তিভাজন হইতে হইবে।

আদেশ দিয়াই কবির কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। লঞ্চ-চালকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে রহমৎ বলিল, "সামনের ঘাটে লঞ্চ লাগাও ওসমান।"

চিন্তিত স্বরে ওসমান বলিল, "ঝিঙ্গুরখোলার ঘাটে?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ এখানে, রাত্রে?"

'মালিকের মর্জি।"

"দেরি হবে না-কি?"

"সেটা খোদার মর্জি।"

ঝিঙ্গুরখোলার ঘাট নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। ষ্টীয়ারিং সামান্য একটু ঘুরাইয়া লঞ্চের গতি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া অতিশয়

নিম্নকণ্ঠে ওসমান বলল, "এখন এখানে এমন কি দরকার পড়ল শুনি ?"

রহমৎ বলিল, "সেটা মালিককে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে এস না ?"

চকিত স্বরে ওসমান বলিল, "মালিককে জিজ্ঞাসা ক'রে আসব ? ক্ষেপেছ না-কি রহমৎ ?"

রহমৎ বলিল, "নিশ্চয় ক্ষেপি নি। ক্ষেপেছ তুমি, তাই এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারছ। আচ্ছা ওসমান, আমাদের মালিকের মনের কথা একমাত্র খোদা ভিন্ন অপর কেউ কখনও জানতে পেরেছে বা জানতে সাহস করেছে ব'লে শুনেছ ?"

"না, তা শুনি নি।" বলিয়া ওসমান এ আলোচনা বন্ধ করিয়া স্টীয়ারিংয়ে মনোনিবেশ করিল।

ঘাটে আসিয়া লঞ্চ একটা নৌকার গায়ে লাগিলে তদুপরি জমিদারকে দণ্ডায়মান দেখিয়া নৌকায় যে কয়েকজন মাঝিমাল্লা ছিল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং 'সেলাম হুজুর,' শব্দে নত হইয়া কবির আহমদকে অভিবাদন করিতে লাগিল।

তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া এবং নৌকা হইতে ভূমিতে তক্তা পাতিয়া দিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া কবির আহমদ তটের উপর লাফাইয়া পড়িয়া গ্রামের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইল। তাহার দক্ষিণ হস্তে একটা মোটা লাঠি এবং বাম হস্তে শক্তিশালী টর্চ।

অপ্রশস্ত পথ; অধিকাংশ স্থলেই দুইটা গরুর গাড়ি পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে না। পথের দুই ধারে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, রাত্রির অন্ধকারে নিবিড় অরণ্যের ন্যায় দেখাইতেছে। এখনও সাতটা বাজে নাই, ইহারই মধ্যে নদীর পথ জনমানবশূন্য হইয়া গিয়াছে।

আধ পোয়াটাক পথ অতিক্রম করিবার পর সহসা পিছন দিকে

কবির পদধ্বনি শুনিতে পাইল। "কে ?"—বলিয়া পিছন ফিরিয়া টর্চ ফেলিতেই দেখিল, হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া রহমৎ অনুসরণ করিতেছে।

বিরক্তিকটু স্বরে কবির জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আসছিস যে ?"

কবিরের ভঙ্গী দেখিয়া রহমতের মুখ শুকাইয়া গেল ; স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "অন্ধকার রাত্রি, জায়গাটাও তেমন ভাল নয়—"

নদীর দিকে লাঠি দেখাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে কবির বলিল, "যা লঞ্চে গিয়ে বোস্।"

কোনও কথা বলিতে সাহস না পাইয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় রহমৎ ইতস্তত করিতে লাগিল।

কবির গর্জন করিয়া উঠিল, "যা বলছি।"

এই ব্যাঘ্রনাদের পরও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে এমন সবল বুকের পাটা সারা ইসমাইলপুরের এলাকায় কাহারও ছিল না ; রহমতেরও না। ক্ষুণ্ণ মনে সে লঞ্চে ফিরিয়া গেল। কবির আহমদও সম্মুখে অগ্রসর হইল।

নিতান্ত যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হইতেছিল তদ্ভিন্ন কবির টর্চ নিবাইয়াই চলিতেছিল। টর্চ জ্বালিলে শুধু টর্চের রশ্মিরেখার পথটুকু আলোকিত হয়, কিন্তু দুই পার্শ্বের অন্ধকার আরও যেন ঘনীভূত হইয়া উঠে। শীতকালের শুষ্ক ধূলাবালির পথের শুভ্র অস্পষ্ট রেখা নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে যেটুকু দেখা যাইতেছিল তাহার সাহায্যে পথ চলায় বিশেষ অসুবিধা ছিল না।

আরও আধ পোয়াটাক পথ অতিক্রম করিবার পর সহসা বাম পার্শ্বে এক জায়গায় কিসের খস্‌খস্ শব্দ হইল, এবং পর-মুহূর্তেই গাছপালার অন্তরাল হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "কে যায় ?"

নিমেষের মধ্যে কবির শব্দের দিক লক্ষ্য করিয়া টর্চের আলো ফেলিল, কিন্তু সে আলো পড়িল একটা ঘন ঝোপের উপর।

তাহার অন্তরাল হইতে যে ব্যক্তি কথা কহিয়াছিল তাহাকে দেখা গেল না।

"ভয় নেই, আমি বন্ধু।" বলিয়া কবির পুনরায় টর্চ নিবাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

অন্তরাল হইতে অজানা মনুষ্যকণ্ঠ দৃঢ়ভাবে বলিল, "দাঁড়াও। ও-কথা বললে চলবে না—অসুবিধেয় পড়লে অনেক মিঞাই বন্ধু ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকে। এত রাত্রে অন্ধকারে টর্চ নিবিয়ে নদীর দিক থেকে হনহন ক'রে গ্রামে ঢুকছ,—তোমাকে ত দুষমন ব'লেই মনে হচ্ছে। নামটা ব'লে যেতে হবে।"

কবির কয়েক পদ আগাইয়া গিয়াছিল, পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া গভীর স্বরে বলিল, "আর, না বলি যদি ?"

"না বল যদি, তা হ'লে শুধু একটা হাঁক দেব; তারপর দেখবে শাঁকের আওয়াজে, লণ্ঠনে আর লাঠিতে সমস্ত গ্রামটা সরগরম হয়ে উঠেছে। তখন কিন্তু বিশেষ সুবিধে মনে করবে না। নাম বল।"

পূর্বেরই ন্যায় গভীর কণ্ঠে কবির বলিল, "নাম বললে তুমিও কিন্তু বিশেষ সুবিধে মনে করবে না। আমার নাম কবির আহমদ।" বলিয়া ক্ষণেকের জন্য নিজ মুখের উপর টর্চের আলো ফেলিয়া নিবাইয়া দিল।

ইহার পর, শুধু সেই অদৃশ্য ব্যক্তিই নহে, চতুর্দিকের দুশ্ছেদ্য অন্ধকার পর্যন্ত যেন সহসা সুনিবিড় স্তব্ধতায় জমাট বাঁধিয়া গেল। দূর হইতে অস্ফুট কণ্ঠে কেহ বলিল, "পালিয়ে যান" কিন্তু পর-মুহূর্তেই মড় মড় শব্দে গাছ-গালা খড়-পাতা মাড়াইয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া যুক্ত করে এক মনুষ্য-মূর্তি কবিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া সানুনয় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "অন্ধকারে চিনতে পারি নি হুজুর। গোলামের গোস্তাকি মাপ করতে মেহেরবানি হয়।"

সেই ব্যক্তির মুখের উপর টর্চের আলো ফেলিয়া কবির বলিল, "বাংলা ভাষায় কথা কইছ না কেন? তুমি কি মনে করেছ গোলামের গোস্তাকি বললে আমার মেহেরবানি বেশী হবে?"

যুক্ত করে বিনীত কণ্ঠে সেই ব্যক্তি উত্তর দিল, "আজ্ঞে, তা নয় হুজুর। আপনারা রাজা মানুষ, আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে গেলে আমাদের মুখ দিয়ে রাজভাষাই বের হয়।"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কবির বলিল, "রাজা ত ইংরেজ, আর রাজ-ভাষা ত ইংরেজী।"

"আজ্ঞে হুজুর, আমাদের পক্ষে আপনারাই রাজা।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কবির বলিল, "তোমার নাম কি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া একবার ঢোঁক গিলিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "অধমের নাম রসরাজ তরফদার।"

রসরাজের মুখের উপর আর একবার টর্চের আলো ফেলিয়া তীক্ষ্ণ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কবির বলিল, "ও! আপনি তা হ'লে রসু ঠাকুর?"

কবিরের মুখে নিজের ডাকনাম শুনিয়া রসরাজের মুখ শুকাইয়া গেল; ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার নামে হুজুর যা-কিছু শুনেছেন, বিলকুল মিথ্যে কথা। গ্রামে আমাদের শত্রুর অভাব নেই। আমাদের সঙ্গে বিপিন পাকড়াশীদের তিন পুরুষের আকোছ।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কবির বলিল, 'আপনি মানব-সমিতির সভ্য?"

মানব-সমিতির নামে আর একবার রসরাজের মুখ শুকাইল; কপট বিস্ময়ের সুরে সে বলিল, "হরিহর বাঁড়ুজ্জের সেই ধিঙ্গী মেয়েটার সভার কথা বলছেন ত হুজুর? রাধামাধব! আমরা হলুম তার বিপক্ষ দল। আমরা ওদের একঘরে করবার মতলব

করছি। হরিহরের সেই ভ্রষ্টা মেয়েটা সমস্ত গ্রামখানা নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টায় আছে।"

কবির বলিল, "সেই ভ্রষ্টা মেয়েটার সঙ্গে আমি দেখা করতে চলেছি। আমাকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন চলুন। আমি পথটা ঠিক চিনতে পারছি নে।"

প্রস্তাব শুনিয়া রসরাজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "এখনি আহ্নিকে বসব মনে করে-ছিলাম হুজুর, আর কিছু নয়, প্রশস্ত সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে আর একজন লোক দিই নে কেন, সে আপনাকে পৌঁছে দিক?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কবির বলিল, "শুধু পৌঁছে দেওয়াই ত নয়, হরিহর বাঁড়ুজ্জের কন্যার সম্বন্ধে আপনি আমার কাছে যা যা বললেন, সব তার কাছে বলতে হবে।"

সভীতিকণ্ঠে রসরাজ বলিল, "আমি ত এমন কিছু অন্যায় বলি নি হুজুর।"

"ন্যায়-অন্যায় জানি নে, যা আমাকে বলেছেন তাই বলবেন। তাকে ধিঙ্গী বলেছেন, ভ্রষ্টা বলেছেন, সমস্ত গ্রামটা নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টায় সে আছে তা বলেছেন; তারপর আপনারা ওদের একঘরে করবার মতলব করছেন সে কথাও বলেছেন। এই সব কথাই বলবেন।"

কবিরের কথা শুনিয়া রসরাজ কাঠ হইয়া গেল। প্রত্যুত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বাক্‌শক্তি হারাইয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

কবির বলিল, "কি তরফদার মশায়, উত্তর নেই কেন? বাঁড়ুজ্জে মশায়ের কন্যার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন না-কি?"

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া চতুর্দিক হইতে প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকে কবির ও রসরাজের কথোপকথন শুনিতেছিল, সে কথা

রসরাজ জানিত। নিজের হীনতা প্রকাশে তাহাদের নিকট গুরুতরভাবে প্রতিষ্ঠা হারাইবার আশঙ্কায় অতি মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "আপনি আশ্রয়দাতা মালিক, পিতৃতুল্য—আপনার কাছে মিথ্যা বলব না, ভয় পাচ্ছি।"

প্রতিষ্ঠাদের বাড়ি পর্যন্ত রসরাজকে টানিয়া লইয়া যাইবার কল্পনা কবিরের মনে কখনই ছিল না। সে বলিল, "আচ্ছা, বাড়ি পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে না, দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।"

কবিরের কথায় খুশী হইয়া রসরাজ বলিল, "আজ্ঞে, তা চলুন।" বলিয়া অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে কবির বলিল, "প্রতিষ্ঠার চেয়ে বয়সে আপনি কত বড় তরফদার মশায় ?"

মনে মনে একটা হিসাব করিয়া লইয়া রসরাজ বলিল, "পনেরো ষোল বৎসরের বড় হব।"

"এত বড় হয়েও আপনি তাকে ভয় করেন ?"

রসরাজ বলিল, "তার কাছে বড়-ছোটর কথা নেই হুজুর। সেই সর্বনেশে মেয়েকে সকলেই ভয় করে।"

কবির বলিল, "সেই সর্বনেশে মেয়েকে এবার থেকে আপনি শুধু ভয়ই করবেন না, শ্রদ্ধাও করবেন। আর ভ্রষ্টা যে কখনই নয়, তাকে কদাচ ভ্রষ্টা বলবেন না। নিজের মুখকে এমন ক'রে ময়লা করতে নেই।"

এই কঠোর সত্যভাষণ এবং মন্তব্যপ্রকাশের বিরুদ্ধে বলিবার মতো কোনও কথাই রসরাজ খুঁজিয়া পাইল না! নির্বাক হইয়া সে পথ দেখাইয়া চলিল।

কবির বলিল, "প্রতিষ্ঠাকে আপনি ভ্রষ্টাই বলুন আর যাই বলুন, প্রতিষ্ঠার মানব-সমিতির আপনি একজন নাম-লেখানো সভ্য। মানব-সমিতির সভ্যদের সম্পূর্ণ তালিকা আমার কাছে

আছে। সে তালিকায় আপনার স্থান অনেক ওপরে। প্রথম দশ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই।”

রসরাজ বলিল, “আপনি সর্বজ্ঞ আপনার কাছে সত্য কথা গোপন ক’রে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ, আমি মানব-সমিতির নাম-লেখানো সভ্য বটে। কিন্তু কেন সভ্য, সেটা ত বিচার করবেন হুজুর

“কেন?”

“সভ্য হয়ে ভেতরে না থাকলে ভেতরের কথা জানতে পারা যাবে কেন বলুন?” বলিয়া কৈফিয়তে কবিরকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে মনে করিয়া রসরাজ অল্প একটু হাসিল।

রসরাজের কথা শুনিয়া এবং হাসি দেখিয়া কবিরের অন্তরিন্দ্রিয় পর্যন্ত ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল, “গুপ্তচর?”

অনুমানে ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রসরাজের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, “তা আপনি যাই বলেন হুজুর।”

কবির কিন্তু প্রকাশ্যে আর কিছু বলিল না। মনে মনে বলিল, হায় প্রতিষ্ঠা! এই সব অমানব নিয়ে তুমি যে মানব-সমিতি গঠিত করেছ তার সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। এই ঘৃণিত মেরুদণ্ডহীন বিশ্বাসঘাতক লোকেরা হিংসা-পাপের দ্বারা তোমার সকল শুভ প্রচেষ্টাকে পণ্ড ক’রে দেবে! এদের ক্লেদাক্ত মনের দূষিত বিষবাষ্পে তোমার নিষ্কলুষ আত্মার পবিত্র দীপ্তি মলিন হয়ে উঠবে।

বাম ধারে একটা অপ্রশস্ত পথ সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছিল। মোড়ে দাঁড়াইয়া সেই দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া রসরাজ বলিল, “একটুখানি এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ঐ যে একটা বড় কদমগাছ দেখছেন—”

রসরাজকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া কবির বলিল, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না।" তারপর হন হন করিয়া সেই কদমগাছের দিকে অগ্রসর হইল।

হরিহর বাঁড়ুজ্জের বহিঃপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ কদমগাছ আছে তাহা কবিরের মনে পড়িল।

চার

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া কবির জনমানবের চিহ্ন দেখিল না। বাহিরের ঘরের দ্বার বন্ধ ; কিন্তু মনে হইল, ভিতরে আলো জ্বলিয়া গুন্ গুন্ স্বরে কেহ বই পড়িতেছে। বারান্দায় উঠিয়া সে ঘরের দ্বারে ধীরে ধীরে কড়া নাড়িল।

শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়া বন্ধ হইয়া গেল, এবং পর-মুহূর্তেই দ্বার খুলিয়া মুখ বাড়াইল একটি বারো-তেরো বৎসরের সুশ্রী বালক।

স্মিতমুখে বালকটি অভ্যাগতকে ভিতরে আহ্বান করিল, এবং কবির কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহার বসিবার জন্য একটা চেয়ার আগাইয়া দিল।

চেয়ারে উপবেশন করিয়া কবির বালকের পরিচয় লইয়া জানিল, সে হরিহর বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ।

কবির বলিল, "তোমার বাবা বাড়ি আছেন অরবিন্দ ?"

ঘাড় নাড়িয়া অরবিন্দ বলিল, "আজ্ঞে না। বাবা কাল বৈকালে পৈতেডাঙ্গা গেছেন, কাল সকালে আসবেন।"

ফিরিয়া যাইবে কি না মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কবির জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি আছেন ? প্রতিষ্ঠা দেবী ?"

"হ্যাঁ, তিনি আছেন।"

ভেস্ট পকেট হইতে ভিজিটিং কার্ড বাহির করিয়া অরবিন্দের হাতে দিয়া কবির বলিল, "এই কার্ডখানা তোমার দিদিকে দিয়ে বলগে, কবির আহমদ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

কবিরের কথা শুনিয়া কৌতূহলে বালকের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া

উঠিল ; আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি জমিদার কবির আহমদ ?"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "হয়ত হতে পারি, কিন্তু আপাততঃ আমি ভদ্রলোক কবির আহমদ। যাও, তোমার দিদিকে কার্ডখানা দাওগে।"

আর কিছু না বলিয়া পুলকিত চিত্তে অরবিন্দ অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

মিনিট তিন-চার পরেই কক্ষে প্রবেশ করিল প্রতিষ্ঠা। একুশ বৎসর বয়সের অপরিণত যুবতী সে, কিশোরী বলিলেও বোধ করি অসঙ্গত হয় না,—কিন্তু সমস্ত অঙ্গ জুড়িয়া এমন একটা অপরূপ মহিমার লীলা, যাহার নিকট অবনত হয় না এমন দৃঢ়বস্তু সংসারে বিরল। কবির আহমদ তাহাকে যে সুন্দরী না বলিয়া রূপসী বলিয়াছিল, প্রতিষ্ঠাকে দেখিলে মনে হয় সে কথার একটা কিছু অর্থ আছে। তাহাকে সুন্দরী বলিলে যেন তাহার সবটাই বলা হয় না, কিছু বাকি থাকিয়া যায়।

কবিরের বাঘিনী সে, চিত্তনাথের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, রসরাজের সর্বনাশী মেয়ে। এই সর্বনাশী মেয়েদের পদতলে রাজার রাজমুকুট লুণ্ঠিত হয়, তপস্বীর তপস্যা নষ্ট হয়, অসাধুর অসাধুত্ব পুড়িয়া ছাই হয়। ইহারা নিজেরা কিন্তু অক্ষয়, অব্যয় ; ইহাদের বিকার নাই, বিকৃতি নাই, বিনাশ নাই।

প্রতিষ্ঠা কক্ষে প্রবেশ করিতেই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে কবির বলিল, "মানব-সমিতির মাননীয়া অধিনায়িকাকে দানব-সমিতির দীন অধিনায়ক ঈদ-মোবারক জানাতে এসেছে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কবিরের কথা শুনিয়া প্রতিষ্ঠার মুখমণ্ডল নিঃশব্দ অপরূপ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যুক্ত করে কবিরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিতে লাগিল, "এসেছেন ? তাঁর আসার আশা ক'রেই

ত আছি। দানব-সমিতির, দীন নয়, দুর্জয় অধিনায়কের প্রতি মানব-সমিতির দীন সেবিকা ঈদ-মোবারক জানাচ্ছে। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, দরিদ্রের কুটিরে আপনার শুভাগমন হয়েছে!' তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বসুন, বসুন আমেদ সাহেব। কি আশ্চর্য, আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন! বসুন।" বলিয়া যে চেয়ারে কবির আহমদ বসিয়া ছিল, সেই চেয়ারটা কবিরের দিকে আগাইয়া দিল।

কবির বলিল, "আগে আপনি বসুন।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আগে-পরে কাজ নেই, আসুন, একসঙ্গেই বসি।"

চেয়ারে উপবেশন করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আপনি নিজেকে দানব-সমিতির অধিনায়ক বলছিলেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন আহমদ সাহেব, দেব আর দানব উভয়েই কশ্যপ মুনির সন্তান। আর, আমাদের ও আপনাদের কশ্যপ মুনিকে খুঁজতে হ'লে দূর অতীতে যাবার দরকার নেই; দু-চার শো বৎসরের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যাবে।"

সহাস্যে কবির বলিল, "কৈফিয়ত দিতে হবে না প্রতিষ্ঠা দেবী। আপনি যখন আমাকে দানব ব'লে অভ্যর্থনা দিয়েছেন তখনই বুঝেছি, আপনি দানবকে অসম্মান করেন না। আজ আমি এখনি উঠব। পরবের দিন একটু সকাল সকাল বাড়ি না ফিরলে অন্ততঃ আমার লঞ্চে যারা আছে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা, সকাল-সকালই ফিরবেন। কিন্তু দয়া ক'রে বাড়িতে পদার্পণ করেছেন, একটু মিষ্টি-মুখ না ক'রে যাওয়া হবে না।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যস্ত হইয়া কবির বলিল, "আমি এসেছিলাম আপনার পিতা বাঁড়ুজ্জে মশায়ের সঙ্গে একটা জরুরি আলোচনার দিন স্থির ক'রে যেতে। তিনি বাড়ি নেই জানলে হয়ত আসতাম না। কিছু

আগে লঞ্চে ব'সে যে খাওয়া খেয়েছি, তার তাড়নায় তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিলেই আপনার আতিথেয়তা পূর্ণ হবে।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া প্রতিষ্ঠা প্রস্থান করিল, এবং অবিলম্বে কাচের গ্লাসে জল ও কাঁসার রেকাবে চারটি বৃহৎ আকারের সুদৃশ্য সন্দেশ লইয়া প্রবেশ করিল। পিছনে পিছনে একটা কাঠের তেপায়া বহন করিয়া আনিয়া অরবিন্দ কবিরের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

সন্দেশ দেখিয়া কবির মাথা নাড়িল; বলিল, "মিষ্টি একেবারেই চলবে না, জলটুকুই পান ক'রে তুষ্ট হই।" বলিয়া জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াইল।

হাত সরাইয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "না না, কবির সাহেব, ওটুকু মিষ্টি আপনাকে খেতেই হবে। উপাদেয় সন্দেশ, এ তল্লাটে ও-রকম বস্তু তৈরি হয় না, আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছে। নতুন গুড়ের সন্দেশ; এখনো বোধ হয় ও-জিনিস একেবারে নতুনত্ব হারায় নি।"

কবির আহমদের বুঝিতে বাকি রহিল না, আজ সকালে চিত্তনাথ কলিকাতা হইতে সন্দেশ আনিয়াছে। বলিল, "না, এ বৎসরে নতুন গুড়ের সন্দেশ আমার কাছেও একেবারে নতুন। আমি আজ কলকাতা থেকেই আসছি, খেয়াল হয় নি, তা হ'লে খুঁজে-পেতে কিছু নিয়ে আসতাম। আচ্ছা, আপনি আমার হাতে একটা তুলে দিন। ও চারটে সন্দেশ আধ সের ছানার ধাক্কা। উপাদেয় হ'লেও ওর ওজনের দ্বারা শরীরে তকলিফ পৌঁছবে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে অন্ততঃ দুটো খান।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা দুইটি সন্দেশ রেকাব হইতে তুলিয়া লইল।

একটা সন্দেশ ভাঙিয়া মুখে দিয়া কবির বলিল, "সত্যই উপাদেয় জিনিস।" বলিয়া সুস্পষ্ট সন্তোষের সহিত খাইতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় সন্দেশটা শেষ হইয়া আসিলে ঈষৎ আবদারের সুরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "এ দুটো সন্দেশও অনুগ্রহ ক'রে খান কবির সাহেব।" বলিয়া রেকাবে সন্দেশ দুইটা দিতে উদ্যত হইল।

ডান হাতের তর্জনী উঁচু করিয়া কবির বলিল, "একটা।"

দুইটা সন্দেশই রেকাবে দিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "তিনটে শত্রুকে দেয়; তিনটে দিতে নেই।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কবির বলিল, "আমি যে আপনার শত্রু নই তা আপনি কি ক'রে জানলেন?"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা হয়তো জানি নে, কিন্তু চারটে সন্দেশ দিয়ে মিত্রতার পথ খোলা রাখলাম।"

"কিন্তু মিত্রতার পথ সন্দেশের আগেই যে খোলে নি, সে বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ কি?"

তেমনই হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, সে বিষয়ে অবশ্য আমি নিঃসন্দেহ নই।"

চারটি সন্দেশ শেষ করিয়া জলের গ্লাস হাতে তুলিয়া কবির কহিল, "ইসমাইলপুরে গিয়ে আর একটি দানাও আজ পেটে যাবে না। শুধু এই রকম আর এক গ্লাস জল পান ক'রেই আজকের মতো দানাপানির কারবার শেষ করব।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "না না, এমন আর কি খেলেন! আজ ঈদের দিন, সন্দেশ বেশী থাকলে বাড়ির লোকের জন্যে সঙ্গে কিছু দিতাম।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া কবির বলিল, 'না না, সে আবার কি কথা! বাড়ির লোকের জন্যে কি দেবেন!"

প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়িতে কে কে আছেন?"

"ধরতে গেলে আমি আর আমার ছোট ভাই সুলতান—এক ঢোল, এক কাঁসি। অবশ্য দূর-সম্পর্কের এক ফুফু আছেন, কিন্তু বাতে আর জরায় তিনি প্রায় স্থবির।"

"আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কবির সাহেব ?"

"করব সে মতলবও এ পর্যন্ত করি নি।" বলিয়া কবির উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কবিরের হাস্যে প্রতিষ্ঠার মুখেও মৃদুহাস্য দেখা দিল ; বলিল, "আপনার ছোট ভাই সুলতান সাহেবের বয়েস কত ?"

"সুলতানের ? ছেলেমানুষ সুলতান, আমার চেয়ে অনেক ছোট। আঠার-উনিশ বৎসরের বেশী হবে না।"

"কি করেন তিনি ?"

"তিনি ছবি আঁকেন আর কবিতা লেখেন। আকাশের জীব তিনি, জমির কেউ নন ; তাই জমিদারি তাঁর আসে না। ঘরে মাস্টার রেখে দিয়েছি, মাস্টারের কাছে কিছু কিছু ইংরিজী সাহিত্য আলোচনা করেন।"

"চমৎকার ত !"

"হ্যাঁ, খুব চমৎকার! তিনি তুলি চালান ব'লে আমাকে একাই লাঠি চালাতে হয়। লাঠি না চালালে জমিদারি চলে না সে কথা তিনি বোঝেন না।....আচ্ছা, এখন আসি।" বলিয়া কবির গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইল।

দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে কবিরকে নিবৃত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা, দয়া ক'রে এক মিনিট বসুন, এখুনি আসছি।" বলিয়া ভিতরে গিয়া তাহার মাতা শৈলনন্দিনীকে বলিল, "মা আজ ঈদ, কবির সাহেবের বাড়ির জন্যে কিছু মিষ্টি দিতে পারলে ভাল হয়। গোটা আষ্টেক সন্দেশ দিতে পারা যাবে কি ?"

কবিরের খাইবার জন্য সন্দেশ বাহির করিবার সময়ে শৈলনন্দিনী সন্দেশের পরিমাণ দেখিয়াছিল ; বলিল, "তা পারা যাবে। কিন্তু দিবি কিসে ?"

চিত্তনাথ এক টিন চকলেট আনিয়াছিল। প্রতিষ্ঠা বলিল, "চকলেটের টিনটা খালি ক'রে ঐটেতে দিলেই হবে।"

"তা হবে।" বলিয়া শৈলনন্দিনী সন্দেশ আনিতে গেল। সেই অবসরে প্রতিষ্ঠা চকলেটের টিনটাও খালি করিয়া ফেলিল।

সন্দেশ আনিয়া শৈলনন্দিনী একটি একটি করিয়া সন্দেশ টিনে ভরিতে লাগিল। টিন ভরিয়া গেলে প্রতিষ্ঠা বলিল, "এগারোটা দিলে যে মা?"

শৈলনন্দিনী বলিল, "জায়গা খালি রেখে কি দেওয়া যায় পিতু?"

"কিন্তু বাবার জন্যে থাকবে ত?"

হাসিমুখে শৈলনন্দিনী বলিল, "সে ভাবনা নেই তোর, ওঁর জন্যে চারটে আলাদা ক'রে সরিয়ে রেখেছি। যা তোমার দানের বহর, সেই ভেবেই ত চিত্ত অত সন্দেশ এনেছিল। ছোট সন্দেশ ত বোধ হয় গোটা পঞ্চাশ ছিল, গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতেই শেষ হয়েছে।"

মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে প্রতিষ্ঠা সন্দেশের টিনটা একটা কাগজ দিয়া সুচারুরূপে মুড়িতেছিল। মোড়া হইয়া গেলে আঠা দিয়া খোলা মুখগুলা আঁটিয়া তাহার উপর লিখিল,—"ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীমান্ সুলতান আহমদকে ঈদের উপহার।—আশীর্বাদিকা প্রতিষ্ঠাদিদি"।

শৈলনন্দিনীকে লেখাটা পড়াইয়া হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "যা কড়া লোক, নিলে হয়।"

শৈলনন্দিনী মুখে এ কথার কোনও উত্তর দিল না; মনে মনে বলিল, তোমার কাছে নরম না হয় এমন কড়া লোক ভারতবর্ষে আছে ব'লে ত মনে হয় না।

প্রতিষ্ঠা বাহিরে আসিলে তাহার হাতে কৌটা দেখিয়া কবির সবিস্ময়ে কহিল, "এ আবার কি আনলেন! সেই সন্দেশ বোধ হয়?"

স্মিত অপ্রতিভ মুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "সামান্য কয়েকটা মাত্র।"

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কবির বলিল, "না না, এ ভারি অন্যায়! বাড়িতে বিয়ে নেই, পৈতে নে কলকাতা থেকে সন্দেশ এসেছে, সে ত এমন বেশী কিছু আসব্বার কথা নয়,—তার মধ্যে চারটে খাওয়ালেন আমাকে, আবার এক বাক্স দিতে চাচ্ছেন সঙ্গে! এই সহৃদয় আত্মীয়তার জন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি,—আমি আপনার কাছে এর জন্যে কৃতজ্ঞ; কিন্তু ও আপনি দয়া ক'রে বাড়ির ভিতর রেখে আসুন।"

"কিন্তু এখানে এ জিনিস কে খাবে বলুন ত?"

"কেন, আপনারা খাবেন।"

"আচ্ছা, এর পর এ জিনিস কারো মুখে রুচবে?" বলিয়া প্রতিষ্ঠা বাক্সর কাগজের উপরের লেখাটা কবিরের সামনে তুলিয়া ধরিল।

লেখাটা পড়িয়া দেখিয়া কবির বলিল, "ইয়া আল্লাহ্!" তারপর বাক্সটা গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া গভীর স্বরে বলিল, "নাঃ, আমাকে হার মানালেন প্রতিষ্ঠা দেবী। দিন।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "না না, আপনি নেবেন কি! অরবিন্দ আর আমি দুই ভাই-বোনে আপনার সঙ্গে গিয়ে লঞ্চে দিয়ে আসব।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কবির বলিল, "নদী পর্যন্ত এতখানি পথ আপনারা যাবেন এই জিনিসটা তুলে দিতে! না না, আপনার যাওয়া কিছুতেই হয় না। দিন বাক্সটা আমাকে।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা, অরবিন্দই না হয় যাক আপনার সঙ্গে?"

মাথা নাড়িয়া কবির বলিল, "তারও দরকার নেই। ও পড়ছিল, পড়ুক। তা ছাড়া, আমি যখন আসছিলাম তখনই নদীর পথ নির্জন হয়ে গিয়েছিল। এতখানি পথ একা ফিরতে ছেলেমানুষ ভয় পেতে পারে।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়াবার

দর্প যখন ওদের, সন্ধ্যাবেলা নদীর পথে একা চলতে ভয় পেলে চলবে কেন?" তারপর কিছু সঙ্কোচের সহিত ঈষৎ দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল, "কিছু মনে করবেন না কবির সাহেব, রজনী দাসের পুত্রবধূর ব্যাপার নিয়ে এ গ্রামে এমন উত্তেজনা হয়ে রয়েছে যে, এই রাত্রের অন্ধকারে একা আপনাকে ছাড়তে আমার মন চাচ্ছে না।"

ঈষৎ বক্র হাস্যের সহিত কবির বলিল, "ফুঃ! সেই ভয়ে ছেলেমানুষকে সঙ্গে নিতে হবে না কি? তার পর কাপুরুষের ভীরু হাতের লাঠি আমার মাথায় না প'ড়ে যদি তার মাথায় পড়ে, তা হ'লে সে লজ্জা রাখব কোথায়? না প্রতিষ্ঠা দেবী, আপনাদের কাউকে যেতে হবে না। আমার দেহে যা শক্তি, আর পকেটে যা ব্যবস্থা আছে, তার ওপর ডান হাতের এই মোটা লাঠি—এ সবের বিরুদ্ধে রজনী দাসের দল কিছু করতে পারবে না।"

"কিন্তু রজনী দাসের দল সামনে থেকে ত কিছু করবে না; করবে পেছন থেকে।"

সহাস্যমুখে কবির বলিল, "শক্তির অভাবে সামনে থেকে করবে না; আর সাহসের অভাবে পিছন থেকে করবে না। সাহসের অভাব, কারণ তারা জানে, যে-প্রোটেক্শন তারা রজনী দাসের বিধবা ভাদ্রবউকে রজনী দাসেরই অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে দিতে পারে নি, সেই প্রোটেক্শন আমি দিয়েছি সেই আশ্রয়-প্রার্থিনী শরণাপন্না সাবালিকা মেয়েটিকে। পুলিসের হেপাজতে মালিনী দাসকে কলকাতার বিধবা-আশ্রমে পাঠিয়ে আমি কি খুব অবৈধ কাজ করেছি প্রতিষ্ঠা দেবী?"

প্রতিষ্ঠা একটু হাসিল; তারপর এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিল, "এ প্রশ্নেরও কি আমাকে উত্তর দিতে হবে কবির সাহেব?"

একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কবির বলিল, "না, উত্তর দিতে হবে না। আপনি যদি দয়া ক'রে কোনোদিন ইসমাইলপুরে অধমের

গরিবখানায় পদার্পণ করেন তা হ'লে লিখিত প্রমাণ দেখাতে পারব যে, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গিয়ে আপনি ঝিঙ্গুরখোলার হিন্দু অধিবাসীদের কতটা বিরাগভাজন হয়ে আছেন।"

সকৌতূহলে প্রতিষ্ঠা প্রশ্ন করিল, "লিখিত প্রমান কি রকম ?"

কবির বলিল, "সে কাহিনী আজ থাক্। যেদিন স্বচক্ষে দেখবেন, সেইদিনই জানবেন। আজ উঠি।" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হ'ল না, অথচ তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা ছিল বলছেন। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে বাবা কি ইসমাইলপুরে যাবেন ?"

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কবির আহমদ বলিল, "না না, বাঁড়ুজ্জে মশায়কে কষ্ট ক'রে যেতে হবে না, আমি না হয় আর একদিন আসব।" এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিল, "কাল সকালে তিনি আসবেন ত ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা আসবেন।"

"আচ্ছা তা হ'লে কাল বৈকাল চারটের সময়ে আমি যদি আসি ?"

উৎফুল্ল মুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আসবেন ? খুব ভাল কথা। আমি বাবাকে ব'লে রাখব তিনি যেন সে সময়ে বাড়ি থাকেন।"

"বহুৎ ঠিক। দিন।" বলিয়া কবির সন্দেশের কৌটার দিকে হাত বাড়াইল।

সহাস্যমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "যথাসময়ে দেব। আপাততঃ চলুন, খানিকটা পথ আপনাকে এগিয়ে দিই।" বলিয়া ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল, "অরু!"

কাছেই ছিল অরবিন্দ; ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি দিদি ?"

"দোর দিয়ে তুই যেমন পড়ছিলি, পড়্। আমি কবির সাহেবকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

অরবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।" তারপর কবির আহমদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সেলাম কবির সাহেব!"

"সেলাম! সেলাম!" উচ্ছ্বসিত আগ্রহে আগাইয়া আসিয়া অরবিন্দকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া কবির বলিল, "লজ্জা দিয়েছ ভাই অরবিন্দ। তোমার কাছে বিদায় না নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে অপরাধ করেছিলাম। কাল কিন্তু আবার আসছি।"

উৎফুল্লমুখে অরবিন্দ বলিল, "আসবেন? নিশ্চয় আসবেন।"

"আচ্ছা।" বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কবির কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল।

পাঁচ

প্রাঙ্গণে নামিয়া প্রতিষ্ঠার সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া কবির আহমদ বলিল, "একটা সদুপদেশ দিই প্রতিষ্ঠা দেবী?"

সহাস্যমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "দিন।"

"এখান থেকেই আমি বিদায় নিই। এই নির্জন পথে রাত্রির অন্ধকারে আমাকে এগিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না আপনার।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা কহিল, "এই সদুপদেশ? কিন্তু, কেন?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিত মুখে কবির বলিল, "আমি মুসলমান যুবক, আপনি হিন্দু কুমারী, আমাদের দুজনকে জড়িয়ে দুর্নাম রটতে পারে।"

কবিরের কথা শুনিয়া মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না না, দুর্নাম রটবার কোনো কথাই নেই। এ গ্রামের সকলেই আমাকেও জানে, আপনাকেও জানে।"

কবির বলিল, "তা হয়ত জানে। কিন্তু আপনি দুনিয়াকে জানেন না প্রতিষ্ঠা দেবী। দুর্নাম রটানোয় যাদের স্বার্থ, তারা জানা-নাজানার অপেক্ষা রাখে না, সুযোগ পেলে রটাবেই। তা ছাড়া, আপনাদের গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে আমার তো দুর্বৃত্ত বলে দুর্নাম আছেই।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "দুর্বৃত্ত ব'লে দুর্নাম কিছু আছে কি না জানি নে, কিন্তু দুর্নাম কিছু আছে। আপনি উগ্রমাত্রায় মুসলমান অনুরাগী; হিন্দুদের প্রতি আপনার শ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা—তারা দল বেঁধে মুসলমান হোক; ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের আপনি একজন প্রবল সমর্থক—এ সব দুর্নাম আপনার আছে। কিন্তু মেয়েদের

মর্যাদা রাখার বিষয়ে আপনার নিষ্ঠা নেই, সে দুর্নাম এ গ্রামে আপনার অতি বড় শত্রুও দিতে পারে না। মালিনী দাসের ব্যাপারে আপনি আপনার শত্রুপক্ষকে ভারি হতাশ করেছেন কবির সাহেব।"

সকৌতূহলে কবির জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে, শুনি ?"

"রজনী দাসের দুর্মোচ্য কবল থেকে মালিনীকে উদ্ধার করার পর কলকাতায় সম্ভ্রান্ত বিধবা-আশ্রমে তার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে। তার বদলে আপনি যদি তাকে নিজের ভোগের জন্যে কোথাও রাখতেন, তা হ'লে রজনী দাসের দল আর একটু উৎসাহের সঙ্গে উত্তেজিত হতে পারত। গ্রামের একজন মাতব্বর লোক কলকাতায় গিয়ে মালিনীর বিধবা-আশ্রমে থাকার খবর পাকা ভাবে জেনে আসার পর তাদের একটু অসুবিধে হয়েছে। এখন তারা এই কথা ব'লে নিজেদের দল বজায় রাখবার চেষ্টা করছে যে, বিধবা-আশ্রম আপনার কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নয়. আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজনা একটু ক'মে গেলেই আপনি মালিনীকে আশ্রম থেকে ছাড়িয়ে আনবেন।"

"এ কথা আপনার গ্রামের লোকে বিশ্বাস করে ?"

"এ কথা গ্রামের প্রায় সকলেই জানে, যে-অভাগী মেয়েটাকে জলে ডুবে মরা থেকে কোনো-রকমে বাঁচানো গিয়েছিল, আপনি তার গতি না করলে সে এতদিনে বিষ খেয়ে মরত। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, রজনী দাস মারাত্মক লোক, কতক লোক, মনে-প্রাণে না হলেও ভয়ে তার কথা বিশ্বাস করবার ভান করে; কতক লোক মনে করে হিন্দুবিধবা-জড়িত ব্যাপারে একটা হিন্দু সংসারে একজন অহিন্দু জমিদারের হস্তক্ষেপ উচিত হয় নি; আবার, কতক লোক আপনার হস্তক্ষেপকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করে। গ্রামে শুধু রজনী দাসই নেই, সৎ এবং সাহসী লোকও আছে। অজিতের কথাই ধরুন না,—দুর্দান্ত রজনী দাসের সর্বনাশা কোপের

সম্ভাবনাকে উপেক্ষা ক'রে যে আপনার কাছে মালিনীর আবেদন পৌঁছে দিয়েছিল। মাত্র পনেরো বৎসর বয়েস, সাহসে সততায় কিন্তু একটি সোনার চাঁদ ছেলে।"

হাসিমুখে কবির বলিল, "আর, আর-একটি হীরের টুকরো মেয়ের কথাও ধরা যেতে পারে, যে চিঠি লিখে আমার কাছে অজিতকে পাঠিয়েছিল।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "কোনো হীরের টুকরো মেয়ে আপনার কাছে অজিতকে পাঠায় নি। পাঠিয়েছিল একান্ত কর্তব্যের তাড়নায় মানব-সমিতির সামান্য সম্পাদিকা।"

অল্প একটু হাসিয়া কবির বলিল. "সামান্য সম্পাদিকার সেই অসামান্য হুকুমনামায় যে ঝলমলানি ছিল, তা একমাত্র হীরের টুকরো মেয়েতেই সম্ভব। কিন্তু সে কথা যাক, আমি ত মানব-সমিতির দুশমন; দুশমনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কোন্ হিসেবে?"

বাঘের দ্বারা বিপন্ন হয়ে হরিণী সিংহের কাছে আবেদন পাঠায় যে হিসেবে, বোধ হয় সেই ধরনের কোনো হিসেবে। তা ছাড়া, কবির সাহেব, আমি হয়ত মানব-সমিতির দুশমনের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলাম, মানব দুশমনের কাছে ত পাঠাই নি।"

প্রতিষ্ঠার উপমাসমৃদ্ধ অপরূপ বাক্যের অভিনব আঘাতে কবিরের অন্তরের গোপনে কোথায় যেন একটা কিছু আলগা হইয়া গেল। আবেগ-উচ্ছল কণ্ঠে সে বলিল, "বহুৎ দুরুস্ত্! হার স্বীকার করছি প্রতিষ্ঠা দেবী। তাহার পর এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল "আপনি যদি মানব-সমিতির সম্পাদিকা, তা হ'লে প্রেসিডেণ্ট কে?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমাদের প্রেসিডেণ্ট নয়, অধিনায়ক। অধিনায়ক কিন্তু উপস্থিত কেউ নেই। আজ পর্যন্ত ও পদ খালি আছে।"

"কেন ?"

"উপযুক্ত মানুষের অভাবে।"

"কি রকম মানুষ আপনাদের মানব-সমিতির অধিনায়ক হবার উপযুক্ত ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে ভাবিয়া লইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "যে পরাক্রান্ত মানুষ তার মুক্তসংস্কার অন্তঃকরণের প্রবল আত্মবিশ্বাসের দ্বারা মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারবে যে, মানুষ সর্বপ্রথম একজন মানব ; তারপর হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান অথবা আর যা-কিছুই হোক না কেন।"

কবির বলিল, "অধিনায়কের পদ চিরদিন আপনাদের খালি থাকবে।"

"কেন ?"

"কারণ, তেমন মুক্তসংস্কার মানুষ কোনোদিনই আপনাদের নজরে পড়বে না।"

মৃদু হাসিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "অন্ধকার আর একটু গাঢ় হ'লে রজনী দাসকেও নজরে পড়বে না। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"সত্যি, তাড়াতাড়ি স'রে পড়াই ভাল। তা ব'লে রজনী দাসের ভয়ে অবশ্য নয়।" বলিয়া কবির উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

পথে পড়িয়া সে কিন্তু একেবারে গুম হইয়া গেল। পাড়াগাঁয়ের পথ, তাহার বাঁধা-ধরা স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা নাই। কাহারও আনাচ দিয়া, কাহারও কানাচ দিয়া, কাহারও বা বহিরঙ্গণের উপর দিয়া, কোন্ পরিকল্পনায় যে তাহার গতি চালিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঈদের দ্বিতীয়ার চাঁদ অস্ত গিয়াছে, তাহার উপর পরিণত হেমন্তের হিমাচ্ছন্নতার অস্পষ্টতায় কোনও কোনও স্থলে পথ বুঝিয়া চলা কঠিন। তাই পথে পদার্পণ করিয়াই প্রতিষ্ঠা আগে পথ ধরিল।

স্বভাবতঃ কবির শক্তি এবং সংযমের সাধক। এই সংযম শুধু আচরণ অথবা বাক্যের নহে,—উভয়তঃই। আচরণে না হোক, আজ প্রতিষ্ঠার সহিত কথোপকথনে সে কি কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে কোনও বাগ্‌বিস্তার অথবা কোনও নাটুকেপনার দ্বারা? সংযমের যে স্তব্ধ কঠিন শিলার উপর তার শক্তি অধিষ্ঠিত, সেই শিলাগাত্রে কি আজ হিল্লোল দেখা দিয়াছিল? কিন্তু গভীর নিম্নে আগ্নেয় উচ্ছ্বাসের ত কোনও কারণ ঘটে নাই। তবে?

আত্ম-পরীক্ষার প্রশ্নে প্রশ্নে কবির নিজেকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

প্রেমকে সে শৌখিন বিলাস বলিয়া মনে করে; কামকে কুৎসিত বিলসন। বিবাহকে সুবর্ণ-শৃঙ্খল মনে করে বলিয়া আজ পর্যন্ত সাতাশ বৎসর ভোগ-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও সে-শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ হয় নাই। নারী তাহাকে রূপে আকৃষ্ট করে না, করে স্বরূপে। সেই স্বরূপের দ্বারাই সে প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু সে আকর্ষণে আজ অন্য কোনও রঙের ছোপ ধরে নাই ত? তাহা হইলে ত আঠার-উনিশ বৎসরের প্রায়-নাবালিকা একটি মেয়ের কাছে আজ তাহার পরাভব।

"একেবারে নিঃশব্দ হয়ে কি অত ভাবছেন কবির সাহেব?"

প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সচেতন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া সহাস্যমুখে কবির বলিল, "ভাবছিলাম, আজ পাঁচ হাজার ভোল্টের একটি বিজলী-কন্যার তাপে ইসমাইলপুরের কঠিন লৌহ-মানব তেমনি কঠিন রইল কি না।"

নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পথ চলিতে চলিতে তাহারা ঝিঙ্গুরখোলা গ্রামের প্রধান লোকালয়ের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে সামান্য একটু উন্মুক্ত স্থান, তাহার পর আট-দশ ঘরের বসতি ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া পথ একেবারে সোজা নদীর উপকূলে উপনীত হইয়াছে।

কবিরের মন্তব্যের কোনও উত্তর না দিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "চলুন, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? নদী পর্যন্ত না যাই, নদীর পথ আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে আসি।"

মাথা নাড়িয়া কবির বলিল, "না, আর এক পা-ও আপনাকে যেতে দোব না। অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, সেই অবসরে অনেকখানিই এগিয়ে দিয়েছেন।"

"পথ বুঝতে পারবেন?"

"অনায়াসে। ওই সামনে কয়েকটা বাড়ির পরই ত নদীর পথ।" তারপর হাসিয়া বলিল, "নতুন পথে চলবার সময়ে দেখে চলার এমন অভ্যাস আছে আমার, যাতে ফিরতি পথে বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় না।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা হ'লে অগত্যা এইখান থেকেই বিদায় নিই। কাল বৈকালে নিশ্চয় আসছেন ত?"

"নিশ্চয় আসছি। যান, তাড়াতাড়ি ফিরে যান, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আপনার গায়ে যে র‍্যাপার আছে তা এমন কিছু গরম নয়। আমার দেহে গরম বস্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা আপনাকে দিতে পারি।"

সহাস্যমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আর, দিলেও আমার দেহে তা মানাবে না,—আপনার চেস্টারফিল্ডও নয়, কোটও নয়।"

কবির বলিল, "আমি কিন্তু সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ নই। এমন কদর্য বস্ত্র অল্পই আছে যা আপনার দেহে মানায় না।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর প্রতিষ্ঠার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "এবার বাক্সটি আমার হাতে দয়া ক'রে দিয়ে লঘু হোন।"

প্রতিষ্ঠার হাত হইতে বাক্সটি সাদরে গ্রহণ করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কবির বলিল, "বিপদে ফেললেন কিন্তু! আপনাকে দেখে পর্যন্ত সুলতান ত আধক্ষেপা হয়ে আছে, তারপর ঈদের এ

অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সওগাত পেয়ে পুরোপুরি ক্ষেপে না যায়! এ সামগ্রী ও মুখে দেবে, না, মাথায় রাখবে, তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

সকৌতূহলে প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "সুলতান আমাকে দেখেছেন?"

"দেখেছে বইকি। মাস দুয়েক আগে মাধবগঞ্জের সভায় আমরা দু ভাইই আপনাকে প্রথম দেখি, তারপর আমার আজ এই দ্বিতীয় দিনের দেখা। সেদিন সভাশেষে সুলতান তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, বোধহয় আপনার উদ্দেশে কবিতা লেখবারই লোভে। আমি কিন্তু আপনাকে একটা থাবা দেখিয়ে যাবার লোভে তক্কে-তক্কে ছিলাম। খোদার মর্জিতে আপনাকে একান্তে আনতে পেরেছিলাম। সেদিনের সেই মিনিট পাঁচেকের সংঘর্ষে বুঝেছিলাম, শুধু ইসমাইলপুরের বাঘেরই থাবা নেই, ঝিঙ্গুরখোলার বাঘিনীরও আছে। সেদিন কে বেশী শাসিয়েছিল—আমি, না, আপনি, তা বলা কঠিন। আমি শাসিয়েছিলাম আপনার মানব-সমিতি চূর্ণ করব ব'লে; আপনি শাসিয়েছিলেন আমার দর্প চূর্ণ করবেন ব'লে। আমি পরাভূত হয়েছি প্রতিষ্ঠা দেবী। আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে, আপনার মানব-সমিতি কিন্তু বহাল তবিয়তে আছে।"

মৃদু শান্ত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "মিষ্টির কিছু অংশ ফুফুকে দেবেন, আর বাক্সটা সুলতানের হাতে দিয়ে বলবেন, তার দিদির স্নেহ-উপহার। আকারে সামান্য, কিন্তু প্রকারে নয়।"

কবির বলিল, "তা যে নয়, তা আমার জানতে বাকি নেই, সুলতানেরও জানতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু আপনি কি ক'রে সুলতানের দিদি হচ্ছেন প্রতিষ্ঠা দেবী? সুলতান আর আপনি বয়সে এত কাছাকাছি যে, কে বড় কে ছোট ঠিক করতে হ'লে দুজনের ঠিকুজি মেলাতে হয়।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা হ'লে ঠিকুজি মিলিয়ে কাজ নেই, সুলতান আমাকে দিদি বলবে, আর আমি সুলতানকে দাদা বলব।"

এক মুহূর্ত স্তব্ধ নির্বাক থাকিয়া প্রতিষ্ঠার দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া গাঢ় গভীর কণ্ঠে কবির বলিল, "সুলতানকেই যদি দাদা বলবে প্রতিষ্ঠা, তা হ'লে সুলতানের দাদাকে কি বলবে তুমি?" তাহার পর আর কোনও কথা না বলিয়া, বোধহয় নাটুকেপনার পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা করিয়াই, দৃঢ়গতিতে বেশ খানিকটা আগাইয়া গেল। তাহার পর কি মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে টর্চটা বাহির করিয়া তাহার উজ্জ্বল রশ্মিরেখা প্রতিষ্ঠার দিকে প্রসারিত করিল।

নিশীথের তিমির-সলিলে হঠাৎ একটি মুখপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। তাহার কুঞ্চিত চক্ষু এবং স্মিত-বিমুক্ত ওষ্ঠাধরকে আশ্রয় করিয়া অপরূপের লীলা।

নিজের পায়ের কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিষ্ঠার পা পর্যন্ত পথের উপর কয়েকবার টর্চের আলোক-রেখা বুলাইয়া বুলাইয়া কবির প্রতিষ্ঠাকে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের জন্য সংশয়াতীত সঙ্কেত জানাইয়া আলোক নিবাইল। মুহূর্ত পরে পুনরায় আলোক জ্বালিয়া সম্মুখে প্রসারিত করিল। সে আলোক গিয়া পড়িল প্রতিষ্ঠার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের শিথিলনিবদ্ধ কবরীর নিম্নে পৃষ্ঠদেশে। —প্রতিষ্ঠা ফিরিয়া যাইতেছে।

হনহন করিয়া কবির নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

ছয়

ইসমাইলপুরের সীমান্ত হইতে অনতিদূরে অবস্থিত মাধবগঞ্জ হিন্দু-মুসলমানের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। মধ্যে সামান্য একটি প্রান্তরের ব্যবধানকে অগ্রাহ্য করিলে ইহাকে ইসমাইলপুরের অংশ বলিয়াও মনে করা চলে।

দুই মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠা মাধবগঞ্জে মানব-সমিতির অধিবেশন করিয়াছিল, স্বল্পবসতি মাধবগঞ্জের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তত নহে, যত ইসমাইলপুরকে লক্ষ্য করিয়া। শত্রুদুর্গকে ভেদ করিতে হইলে দুর্গের নিকটতম নিরাপদ স্থানে সৈন্যসমাবেশ করিতে হয়। সেই কৌশল অবলম্বন করিয়া সে মাধবগঞ্জে অধিবেশন স্থাপন করিয়াছিল।

ইসমাইলপুরের পরাক্রান্ত জমিদার কবির আহমদ সাতাশ বৎসরের যুবক হইলে কি হয়, তাহার মধ্যে পরিণত জমিদারের দার্ঢ্য এবং বিষয়-বুদ্ধি। সে যে মানব-সমিতির প্রতি যৎপরোনাস্তি বৈরভাবাপন্ন, সে তথ্য অবগত হইতে প্রতিষ্ঠার বিলম্ব হয় নাই। বাঘের সহিত সন্ধিস্থাপন না করিয়া সুন্দরবনে বাস করা চলে না। তাই সে সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই কবিরের সান্নিধ্য কামনা করিয়া মাধবগঞ্জের মাঠে অধিবেশন স্থাপন করিয়াছিল। এই সুবুদ্ধির ফল ফলিয়াও ছিল আশাতীত ভাবে। কলিকাতা হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করিয়া আসা সুন্দরী তরুণীর সুঠাম অবয়ব দেখিবার লিপ্সায় এবং মুখপদ্মের বাণী-সৌরভের লোভে ইসমাইলপুরের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী মাধবগঞ্জের মাঠে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এত বড় তামাশা এ অঞ্চলে স্মরণাতীত কালেই যদি কখনও হইয়া থাকে।

কৌতূহলই হউক, অথবা ক্রোধই হউক, অথবা একত্রে উভয়ই হউক, কবির আহমদকেও মাঠে টানিয়া আনিয়াছিল। সঙ্গে আসিয়াছিল তাহার কনিষ্ঠ সহোদর সুলতান আহমদ। জনতা হইতে সামান্য দূরে গাছপালার আড়ালে কতকটা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া একটা কাঁঠালগাছের তলায় দাঁড়াইয়া দুই ভাইয়ে সভার কার্যকলাপ দেখিতেছিল।

প্রথমে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু অল্পক্ষণ কিছু বক্তৃতা করিল। তৎপরে, জনতার তিন দিক হইতে সকলে যাহাতে দেখিতে পায়, সেইজন্য একটা উচ্চ আসনে দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

সেই সহজ প্রাঞ্জল সর্বজনবোধ্য ভাষার বক্তৃতায় না ছিল উচ্ছ্বাস, না ছিল আস্ফালন, না ছিল দাপট, না ছিল দম্ভ। শুধু যুক্তি, শুধু বিচার, শুধু বুদ্ধি, শুধু বিবেচনা সে বক্তৃতার ছিল উপকরণ। ফুলের সৌরভ যেমন ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া নহে, অননুভবনীয় বায়ুর মধ্য দিয়াই যথার্থভাবে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, প্রতিষ্ঠার বক্তব্যও তেমনই নীরবে নির্বিবাদে জনতার অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল।

প্রতিষ্ঠা বলিয়াছিল, তাহাদের মানব-সমিতির আদর্শ হইতেছে —এক ঈশ্বর, এক পৃথিবী, এক মানবজাতি। সুতরাং সমস্ত বসুধার সহিত মানব-সমিতির কুটুম্বিতা। যাহাদের সহিত মানব-সমিতির বিরোধ, তাহাদিগকেও মানব-সমিতি আত্মীয় করিতে চাহে। তাই যাহারা তাহাদিগকে রাজনৈতিক দল মনে করে, তাহারা ভুল করে। তাহারা সমাজনৈতিক দল। তাহাদের স্বপ্ন হইতেছে সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া একটিমাত্র মানব-সমাজ গঠিত করা, যেখানে মানুষে মানুষে শুধু ভ্রাতৃত্বই থাকিবে, ভেদ থাকিবে না। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রথম পদক্ষেপ করিতে চাহিতেছে তাহারা তাহাদের হিন্দু-মুসলমানের মহাদেশ ভারতবর্ষ

হইতে। দেহের যেমন দুই বাহু, তাহাদের দেশেরও তেমনই হিন্দু-মুসলমান। এই দুই মহাজাতির দুই বাহু মিলিত হইলে ভারতবর্ষ একটি বলিষ্ঠ দেহে পরিণত হইবে।

ধর্ম সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বলিয়াছিল, তাহাদের মানব-সমিতির আদর্শের সহিত ধর্ম সংক্রান্ত কোনও সমস্যা অথবা জটিলতা নাই। দেহের আবরণ যেমন পরিচ্ছদ, আত্মার আবরণ তেমনই ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের নিজের নিজের ধর্ম নিজ-নিজ অন্তরের সামগ্রী, বাহিরে তাহা লইয়া কোনও বিরোধ থাকিবার কথা নহে। অদূরে উপবিষ্ট আবদুল করিমকে দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা বলিয়াছিল, "ওই যে ওখানে আবদুল চাচা মশায় ব'সে আছেন, ওঁকে আমি নিজ পিতৃব্যের মতো শ্রদ্ধা করি; আর উনিও আমাকে নিজের ভাইঝির মতো স্নেহ করেন। এ কথায় এই সভায় যদি কারও মনে কোনো সন্দেহ থাকে, আমি তা হ'লে স্বয়ং আবদুল চাচা মশায়কে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাব।"

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া আবদুল করিম উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথায় একমাথা কাঁচা-পাকা চুল, যৌবন-অতিক্রান্ত দেহে যৌবনের বলিষ্ঠতা। সভার চতুর্দিকে একবার ত্বরিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল, "প্রতিষ্ঠা-মার ডাকে এই সভায় দাঁড়িয়ে ইমানের হলফ নিয়ে আমি এজাহার দিচ্ছি, তিনি যে কথা বললেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। তবে একটু ভুল তিনি করেছেন,—আমি তাঁকে ভাইঝির মতো নয়, কন্যার মতো স্নেহ করি। আর একটি কথা তিনি চেপে গেছেন,—আমি তাঁকে জননীর মতো শ্রদ্ধা করি।"

আর কোনও কথা না বলিয়া আবদুল করিম বসিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হর্ষোচ্ছল বাণীতে এবং করতালি-ধ্বনিতে সভা বারংবার মুখরিত হইতে লাগিল।

সভা স্তব্ধ হইলে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আবদুল চাচার বাঁ দিকে

পিছনে ব'সে আছেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ তর্কতীর্থ মশায়। আমি জানি তাঁর আর আবদুল চাচার মধ্যে ভাইয়ে-ভাইয়ের হৃদ্যতা। তাঁর পরনে থান-ধুতি আর আবদুল চাচার পরনে সবুজ রঙের লুঙ্গি। আমি তর্কতীর্থ মশায়ের কাছে সবিনয়ে জানতে চাচ্ছি, এই লুঙ্গি আর ধুতির প্রভেদ কি তাঁদের হৃদ্যতার মধ্যে কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি করে?"

শিবনাথ তর্কতীর্থ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিছুমাত্র না। এমন কি, আবদুল ভায়ার দাড়ি আর আমার শিখার মধ্যেও নিবিড় প্রণয়।"

এবার একটা তুমুল হাস্যধ্বনি ও করতালিতে সভা সরগরম হইয়া উঠিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা হ'লেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাইরের প্রভেদ অন্তরের বিভেদ আনতে পারে না। আর, ধর্ম যখন একান্তই অন্তরের বস্তু, তখন বাইরের অনৈক্যের দ্বারা তার কোনো ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য একবার যদি আমরা স্বীকার ক'রে নিতে পারি, তা হ'লে ধর্মসংক্রান্ত সকল বিরোধের অন্ত হয়। এমন অনেক হিন্দু পরিবার আছে যেখানে গৃহস্বামী হয়ত উগ্র বৈষ্ণবভাবাপন্ন, মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না; অথচ গৃহিণী স্বামীরই কল্যাণে মাছ খান। কিন্তু তাই ব'লে তাঁদের অন্তরের হিন্দুত্বের কোনো তারতম্য হয় না।"

এইরূপে নানা যুক্তি-বিবেচনা, নানা দৃষ্টান্ত-উপমার দ্বারা নিজের বক্তব্যকে প্রতিপন্ন করিয়া উপসংহারে সে বলিয়াছিল, "কেউ কেউ আশঙ্কা করেন, আমাদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে না, অচিরেই এ মোহময় স্বপ্ন নিষ্ঠুর জাগরণের মধ্যে বিলীন হবে। যদি একান্তই তাই হয়, তার জন্যে হতাশ হবার কারণ নেই। জগতে কোন-কিছুরই একেবারে লয় হয় না, কোন-না-কোন আকারে অথবা প্রকারে তা টিকে থাকে। একদিন যেখানে মনে হয়েছিল কিছু

শেষ হল, আর একদিন দেখা যায় সেখান থেকেই তা আবার শুরু হয়েছে। অফলা জমিতে প্রথম চারাটি জন্মানো খুব কঠিন কাজ। যদিই বা জন্মাল, সুপরিণত বৃক্ষ হয়ে ফল প্রসব করবার আগেই তা মাটিতে ঝ'রে পড়ে। কিন্তু তার সে ঝ'রে-পড়া নিস্ফল হয় না;—তার দেহ প'চে গিয়ে মাটিকে সার জোগায়। ক্ষয়ের ভিতর থেকে এমনিভাবে সার পেতে পেতে মাটি সারালো হয়ে ওঠে। তখন তাতে যে গাছ জন্মায়, তাতে ফুল ফোটে, ফল ফলে। আজ থেকে শত বৎসরের মধ্যে বহু বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রম ক'রে যে বিশ্বমানব-সমাজ নিশ্চয় গ'ড়ে উঠবে, এই ক্ষুদ্র মানব-সমিতি তার মাটির প্রথম সারটুকু জুগিয়ে যদি লয় পায়, সে গৌরবময় লয়ের জন্যে আমরা এগিয়ে চলব আমাদের পথ চলার এই মন্ত্রটি মনে মনে গুঞ্জন ক'রে—

'এগিয়ে চল, চলার পথের বিঘ্ন-বাধা বরণ ক'রে,
এগিয়ে চল, চলার শেষের সফল হওয়া স্মরণ ক'রে।'

সভাভঙ্গের ঘোষণা জানাইয়া যুক্ত করে নমস্কার করিয়া প্রতিষ্ঠা অবতরণ করিবার পর তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির শব্দে মাধবগঞ্জের আকাশ মুহুর্মুহু চকিত হইতে লাগিল।

জনতার এত আগ্রহ, এত উদ্দীপনা, এত উত্তেজনা যে, সভা-ভঙ্গের পরও বহু লোক দলে দলে জটলা পাকাইয়া নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা, শলা-পরামর্শে ব্যাপৃত হইয়া রহিল। নিরবধি পাশাপাশি বাস করিয়াও বিবাদে-বিরোধে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দু ও মুসলমান ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন লইয়া যাহাদিগকে বাস করিতে হয়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশই তাহাদের পক্ষে কামনার পরিবেশ। তাই সৌহৃদ্যসহজ সহ-অবস্থিতির মিষ্ট পরিকল্পনায় তাহারা দেহে-মনে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েকজন মাতব্বর-গোছের হিন্দু-মুসলমানের সহিত প্রতিষ্ঠা

এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতেছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "বড় হুজুর সাহেব আপনাকে তলব করেছেন।"

ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই; জিজ্ঞাসা করিল, "কে বড় হুজুর সাহেব?"

উত্তর দিল তাহার দলের একটি মুসলমান; বলিল, "বড় হুজুর সাহেব মানে ইসমাইলপুর তালুকের বড় জমিদার কবির আহমদ সাহেব।"

আগ্রহ ভরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কবির আহমদ সাহেব আমাকে তলব করেছেন? কোথায় তিনি?"

"এই মাঠেই আছেন। ওই কাঁঠালগাছতলায়।" বলিয়া আগন্তুক অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইল।

"চলুন, আমাকে নিয়ে চলুন।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা তাহার সঙ্গীগণের প্রতি চাহিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।"

সঙ্গীগণের মধ্যে একজন বলিল, "আমরা দুই-একজন কি আপনার সঙ্গে থাকব?"

"না, কোনো দরকার নেই। আমাকে ডেকেছেন, আমিই যাই।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা আগন্তুকের সহিত প্রস্থান করিল।

কিছুদূর হইতে কাঁঠালগাছতলায় কবির আহমদকে দেখাইয়া আগন্তুক বলিল, "ওই হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন, যান।"

কবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্ত করে নমস্কার করিয়া সহাস্য মুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমাকে তলব করেছেন কবির সাহেব?"

তীক্ষ্ণনেত্রে এক মুহূর্ত কবির প্রতিষ্ঠার শান্ত সংহত মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, করেছি।"

"কি আদেশ বলুন?"

"প্রথমে অনুরোধ করব। অনুরোধ রক্ষিত না হ'লে

করব আদেশ। আপনি স্ত্রীলোক না হ'লে প্রথমেই আদেশ করতাম।”

সহজকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, “তা হ'লে আপনি আদেশই করুন। স্ত্রীলোক ব'লে আমি আপনার কাছে কোনো বিশেষ বিবেচনা দাবি করি নে, প্রত্যাশাও করি নে।”

“তা হ'লে আমার আদেশ, আপনি অবিলম্বে আপনার এই ছেলেমানুষি বন্ধ করুন।”

“কি ছেলেমানুষি ?”

কণ্ঠস্বর দৃঢ়তর করিয়া কবির আহমদ বলিল, “আপনার এই মানব-সমিতি, না, শিশু-সমিতি নিয়ে ছেলেখেলা।”

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, “আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন না কবির সাহেব, আমাদের সমিতিকে যদি আপনি শিশু-সমিতি মনে করতেন, তা হ'লে আমাকে এমন ক'রে তলব ক'রে না পাঠিয়ে তামাশা দেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যেতেন। আপনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন ; কিন্তু অকারণ।”

চাপা গলায় কবির গর্জন করিয়া উঠিল, “এ সব বাজে কৈফিয়ত বরদাস্ত করবার আমার অভ্যেস নেই।”

প্রতিষ্ঠা বলিল, “কিন্তু আমারই যে বাজে দম্ভ বরদাস্ত করবার অভ্যেস আছে, তা আপনাকে কে বললে ? কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত বলুন।”

এই মর্যাদাহানিকর তাচ্ছিল্যের বাক্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে কবির আহমদ বলিল, “কাজের কথা ! আমি লাঠির চোটে ওই মানব-সমিতি গুঁড়িয়ে দোব।”

প্রতিষ্ঠার দুই চক্ষে ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চিকচিক করিয়া উঠিল ; তিক্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে উত্তর দিল, “আমিও আপনার এই শূন্যগর্ভ দর্প ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। কি এমন আপনি নিজেকে

মনে করেন কবির সাহেব? আপনি রাজা নন, মহারাজা নন, আমীর নন, ওমরাহ নন, আপনি বন দেশের সামান্য একজন জমিদার; কলকাতায় আপনি একজন গোলা লোক, পথের মানুষ। আমাকে ভয় দেখাবার আপনার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজনার নালিশ করার ভয় দেখানো। তা ছাড়া, ভয় দেখাবার আর অন্য কোনো উপায় আপনার নেই। আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় পবিত্র মানব-সমিতিকে আপনি লাঠি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছিলেন। আমরা কিন্তু জানি, সে লাঠি আপনার নিজের লাঠি নয়, পুলিসের লাঠি। পারেন যদি, আপনি আমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিন, মাথা ফাটিয়ে দিন, আমাদের নামে মিথ্যা বকেয়ার নালিশ চালান; কিন্তু দোহাই আপনার, দারোগার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করবেন না। তার চেয়ে কিছু মহৎ কিছু বৃহৎ আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করি।"

এই দীর্ঘ বিদ্রূপের শরাঘাতে কবির যত-না জর্জরিত হইয়াছিল, বিস্মিত হইয়াছিল তার শতগুণ। এ তল্লাটে তাহার ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতিপত্তি; তাহার দাপটে সকলে ত্রাসে তটস্থ হইয়া থাকে। অথচ এই দুঃসাহসিকা বালিকা অবলীলাক্রমে তাহার সেই দৃপ্ত মহিমাকে যে-পরিমাণে অবক্ষিপ্ত করিল, তাহার অর্ধেক করিতে স্বপ্নেও কেহ সাহস করে না। কি করিবে অথবা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া এক মুহূর্ত কবির হতবাক্ হইয়া প্রতিষ্ঠার সেই বিদ্যুৎময়ী দেহশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর লুপ্ত সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া ব্যাঘ্রেরই ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল, "তবে নিজেই একবার মজা দেখিয়ে দোব না-কি?"

অবিচলিত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "এখানে কাজ নেই। এই মাঠে অন্ততঃ একশ বলিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমান যুবক আছে যারা আমার জন্যে প্রাণ দিতে ছুটে আসবে। তার চেয়ে আমাকে নিয়ে চলুন আপনার অট্টালিকায়, সেখানে যা মজা দেখাতে হয় দেখাবেন।

আপনি আর যাই হোন, নীচ নন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার দ্বারা কোনো অনিষ্ট আমার হবে না।"

কবির বলিল, "অনিষ্ট যদি এড়াতে চান, তা হ'লে আমার এলাকা এড়িয়ে চলবেন।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আপনার এলাকা এড়িয়ে চলা ত আমার চলবে না কবির সাহেব। আপনার মদৎ আমাকে পেতেই হবে। যে মরদ, সে-ই মদৎ দিতে পারে; আর যত কটু কথাই ব'লে থাকি না কেন আপনাকে, এ কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলি নি যে, আপনার এলাকায় আপনি শ্রেষ্ঠ মরদ।"

এই নূতন দিক হইতে নূতন অস্ত্রের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিমূঢ় হইয়া কবির আহমদের মতো কঠিন লোকেরও মুখে কোনও উত্তর জোগাইল না। নির্বাক বিস্ময়ে সে শুধু প্রতিষ্ঠার নবভাবরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "দুঃখ রইল কবির সাহেব, আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে গেলেন না। গেলে এই মাঠের চেয়ে কিছু বেশী সুবিধে ক'রে আসতে পারতাম।...যাবার আগে তবু এই মাঠে দাঁড়িয়েই একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে যাই—সেই সৌভাগ্যের দিন খুব পিছিয়ে নেই, যেদিন মানব-সমিতির এলাকার সঙ্গে আপনার এলাকার কোনো বিরোধ থাকবে না।....আচ্ছা যাই। সেলাম।"

পরাজিত বিমূঢ় শত্রুকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রতিষ্ঠা তাহার দলের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

সাত

মাস দুই পূর্বের মাধবগঞ্জ মাঠের এই সকল কথা এলোমেলো ভাবে চিন্তা করিতে করিতে প্রতিষ্ঠা গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল।

চতুর্দিকের ঘন অন্ধকার তাহার দেহকে নিবিড়ভাবে ঘিরিয়া আছে, মনকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে পরিতৃপ্তির এক সূক্ষ্ম রশ্মি। মাস দুই পূর্বে মাধবগঞ্জের মাঠে কবিরকে সাক্ষী মানিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী সে করিয়াছিল, তাহা বাস্তবীভূত হইবার অর্ধপথে আসিয়াছে। ইসমাইলপুরের লৌহমানব শিথিল হইয়া তাহার মধ্য হইতে মানব সমিতির শত্রু নির্গত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এখন মিত্রকে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই বাণী সম্পূর্ণ হয়।

হঠাৎ একাধিক মানুষের দ্রুত পদক্ষেপের শব্দে চকিত হইয়া প্রতিষ্ঠা দেখিল, লাঠি কাঁধে তিনটি মনুষ্যমূর্তি তাহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। প্রথমটা সে একটু বিচলিত হইল ; পর-মুহূর্তেই সাহস সঞ্চয় করিয়া পথের এক দিকে সরিয়া দাঁড়াইল।

লাঠিকাঁধে তিন মূর্তি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "কে ? প্রতিষ্ঠা ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "হ্যাঁ।"

রাত্রির অন্ধকারেও প্রশ্নকারীকে প্রতিষ্ঠা অনুমান করিয়াছিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বুঝিল, রজনী দাস।

ক্রুদ্ধস্বরে রজনী দাস বলিল, "সে শয়তানটা গেল কোথায় ?"

প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ শয়তান ?"

"ইসমাইলপুরের সেই পাকা বজ্জাত শয়তান !"

"কবির আহমদের কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার ছিল ?"

"তাকে সাবড়াবার দরকার ছিল।"

"নদীর দিকে গেছেন, বোধহয় এতক্ষণ লঞ্চে পৌঁছলেন।"

হাতের লাঠিটা সজোরে মাটিতে ঠুকিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে রজনী দাস কহিল, "সব মাটি হয়ে গেল একটু দেরিতে এসে। রসু ঠাকুর খবর দিতে দেরি করায় হাতের শিকার পালিয়ে বাঁচল। পাঁচ মিনিট আগে এলে আর তার রক্ষে ছিল না।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "তার জন্যে দুঃখ নেই রজনীবাবু, কাল আবার আপনাদের শিকার আমাদের বাড়ি আসবেন। কিন্তু কালকেও আজকের মতো পাঁচ মিনিট দেরি করবেন।"

উদ্ধত স্বরে রজনী দাস জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"ঠিক সময়ে এসে সামনাসামনি পড়লে বিপদে প'ড়ে যাবেন।"

হাতের লাঠিটা পুনরায় মাটিতে ঠুকিয়া রজনী দাস বলিল, "ঠাট্টা করছ তুমি ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "ঠাট্টা করছি নে, সাবধান ক'রে দিচ্ছি। মহাপরাক্রমশালী আপনাদের ওই শিকার : সামনাসামনি পড়লে কে কার শিকার হবে, কিছু বলা যায় না। আপনাদের তিনজনের লাঠি একসঙ্গে ওঁর মাথায় পড়লেও সে চোট সামলে পকেট থেকে রিভলবার বার ক'রে আপনাদের গুলি করবার শক্তি উনি রাখেন।"

"ওঁর কাছে রিভলবার আছে, সে কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "কবির সাহেবের নিজের মুখে শুনেছি। কিন্তু সে যাই হোক, ওঁর ওপর আপনাদের এত রাগ কেন ?"

রজনী দাস বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জা

হচ্ছে না? তোমার ওপরও আমাদের কম রাগ নয়। তুমিই ত যত অনিষ্টের মূল। বাঁড়ুজ্জে মশায়কে আমরা নাকি অতিশয় শ্রদ্ধা করি, তাই তোমাকে—"

রজনী দাসকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া প্রতিষ্ঠা, বলিল, "তাই আমাকে মাথা ফাটিয়ে মারছেন না? আমাকেই মারুন আর কবির আহমদকেই মারুন, ফাঁসি আপনাকে যেতেই হবে রজনীবাবু। পুলিসের মারের চোটেই হোক আর অর্থের লোভেই হোক, আপনারই দলের লোক আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে আপনাকে মজাবে। মালিনী-বউদিদির ব্যাপার নিয়ে গ্রামের মধ্যে আপনি প্রকাশ্যভাবে কবির আহমদের বিরুদ্ধে এমন হৈ-চৈ বাধিয়ে রেখেছেন যে, কবির আহমদকে অন্য কোনো কারণে অন্য কেউ মারলেও আপনিই মারা পড়বেন।"

রজনী দাসের সঙ্গী দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, "এ কথা কিন্তু দিদিমণি ঠিকই বলছেন।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আপনি মালিনী-বউদিদিকে ফিরে চান রজনীবাবু? তা যদি চান তা হ'লে তাঁকে আমি ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাকে নিঃসন্দেহে জানতে হবে, মালিনী-বউদিদি ফিরে এলে আপনার স্ত্রী আর কন্যাও খুশী হন। আমি বলি, কি দরকার রজনীবাবু? মালিনী-বউদিদিরও হাড়ে বাতাস লেগেছে, আপনার স্ত্রী-কন্যাও শান্তি পেয়েছেন। কি দরকার আবার বাড়িতে অশান্তির আগুন ফিরিয়ে এনে?"

দলিত সর্পের ন্যায় রজনীকান্ত ক্রোধে ফোঁস করিয়া উঠিল, "তুমি আমার বাড়ির কি এমন খবর রাখ যে, এ সব কথা বল?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি আপনার বাড়ির যেটুকু খবর রাখি তাতে বলতে পারি, সেবার জলে ডুবে মরার হাত থেকে মালিনী-বউদিদিকে যদিই বা কোনো রকমে রক্ষা করা গিয়েছিল, তাঁকে

আপনার বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে কলকাতার বিধবা-আশ্রমে না পাঠাতে পারলে এতদিনে বিষ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করতেন ; আর তাতে পুলিসের হাঙ্গামা সামলাতে সামলাতে আপনাকে হাবুডুবু খেতে হ'ত।"

রজনীকান্ত আবার ফোঁস করিয়া উঠিল, "তোমার এ সব অনধিকার চর্চার কি অধিকার আছে শুনি ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমার এ চর্চা যদি অনধিকার চর্চা হয়, তা হ'লে যে চর্চায় আমার অধিকার আছে, আপনার অন্যায় কাজের প্রতিবাদে সেই চর্চাই করব। আচ্ছা রজনীবাবু, আপনি হরিপুর স্কুলের ড্রিলমাস্টার ব'লে ছাত্রদের শুধু দেহের শিক্ষা দিয়েই কি আপনার সকল দায়িত্বের শেষ ? তাদের মনের দিকটাও সুস্থ রাখবার জন্যে নিজের সুনাম বজায় রাখবার কোনো প্রয়োজনই কি আপনার নেই ?"

শ্লেষবিকৃত কণ্ঠে রজনী দাস বলিল, "থাম ! থাম ! এম. এ. পাস ক'রে মনে করেছ সকলের জ্যেঠামশায় হয়েছ তুমি ! বাজে মন্তব্য রেখে, কি প্রতিবাদ করবে বলছিলে, কর।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমাদের গ্রামে প্রকাশ্য সাধারণ সভা আহ্বান করব। সেই সভায় কবির আহমদকে করব সভাপতি। আর মালিনী-বউদিদিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার সৎসাহসের জন্যে অজিত মিত্রকে দেওয়াব একটা সুবর্ণ-পদক, আর মালিনী-বউদিদিকে রাতারাতি নিরাপদে পৌঁছে দিতে অজিতের সঙ্গে ইসমাইলপুর পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে গণেশকে দশ টাকা পুরস্কার।"

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে রজনী দাস প্রশ্ন করিল, "গণেশ ? কোন্ গণেশ ?"

"কেন, আপনার বাড়িতে যে কাজকর্ম করে সেই গণেশ।"

রজনীকান্তর যে সঙ্গী এ পর্যন্ত কোনও কথা না কহিয়া কতকটা মুখ ফিরাইয়া অবস্থান করিতেছিল, দশ টাকা পুরস্কারের প্রস্তাব

শুনিয়া সে এক-পা এক-পা করিয়া খানিকটা সরিয়া গিয়াছিল, সে-ই গণেশ।

সক্রোধে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া রজনীকান্ত হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "হ্যাঁ রে গণেশ, তুই ছোটবউকে ইসমাইলপুরে পৌঁছিয়েছিলি ?"

স্খলিত কণ্ঠে গণেশ বলিল, "কি করব বড়বাবু, মা-দিদিমণির হুকুম অমান্য করতে পারি নি।"

রজনীকান্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, "হারামজাদা! মা-দিদিমণির হুকুম অমান্য করতে পার নি! আর, যে তোকে ভাত-কাপড়-মাইনে দেয় তার হুকুম পেরেছিলি ?"

হাতের লাঠিগাছা ভূমির উপর রাখিয়া দিয়া গণেশ বলিল, "রইল আপনার লাঠি বড়বাবু। আমরা চাষাভূষো লোক, দরকার হ'লে মানুষকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতেই পারি, গুণ্ডা হয়ে মানুষ মারা আমাদের কম্ম নয়।" বলিয়া হন হন করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "শুনুন রজনীবাবু, যে মলিন কাহিনী শেষ হয়েছে, তাকে জোর ক'রে বাঁচিয়ে রাখলে ক্ষতি হবে সকলের চেয়ে আপনারই বেশী। আর, কবির আহমদকে সাবড়াবার দুর্মতি আপনি ছাড়ুন। আপনার দেহ অবশ্য শক্তিশালী বলিষ্ঠ, কিন্তু কবির সাহেবের তুলনায় কিছুই নয়। সামনে থেকে লাঠি নিয়ে আপনি যদি রিক্তহস্ত কবির সাহেবকে আক্রমণ করেন, তা হ'লে দেখবেন চক্ষের নিমেষে সে লাঠি কবির আহমদের হাতে গিয়ে আপনার মাথার ওপর উদ্যত হয়েছে। আর, পিছন থেকে অতর্কিতে কাপুরুষের মতো যদি আক্রমণ করেন তা হ'লেও সহজে সুবিধে করতে পারবেন না।"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া ক্রোধে রজনী দাস ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

ঝিঙ্গুরখোলার অধিবাসীরা তাহাকে বাঘের মতো না হউক, নেকড়ের মতো ভয় করে। যৌবনের সূচনা হইতেই সে গুণ্ডা-

প্রকৃতির মানুষ, দেহের শক্তি ও ব্যায়াম-কসরতের দক্ষতার বলে হরিপুরের ড্রিল-মাস্টার নিযুক্ত হইয়াছে।

লাঠিটা সজোরে সোজাভাবে মাটিতে ঠুকিয়া রজনীকান্ত বলিল, "তুমি আমাকে এমন করে অপমান করছ কোন্ সাহসে ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "যে সাহসে করছি, সে সাহসের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। কিন্তু অপমান আপনাকে আমি করছি নে, আপনাকে সুবুদ্ধি জোগাবার চেষ্টা করছি।"

"তোমাকে আমি একটা সুবুদ্ধি জোগাব ?"

"কি সুবুদ্ধি বলুন ?"

"তার আগে একটা প্রশ্ন করি। তোমার পট্‌পটানি ত যথেষ্ট শুনলাম, কিন্তু তোমার কবির সাহেব তোমার কাছে যাতায়াত কেন লাগিয়েছেন বলতে পার ?"

অল্প একটু হাসিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমার কবির সাহেব আমার কাছে যাতায়াত কেন লাগিয়েছেন তার কৈফিয়ত আপনার মতো লোককেও দিতে হবে না-কি ?"

"কৈফিয়তের দরকার নেই প্রতিষ্ঠা। আমাদের জানতে বাকি নেই তোমার ঐ নোংরা মানব-সমিতির জালে শুধু কবির আহমদই নয়, অনেক আহমদই একে একে জড়াবে।"

"তবে আমিও লাঠি ফেললাম বড়বাবু।" বলিয়া রজনীকান্তর দ্বিতীয় সঙ্গী তাহার লাঠিটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর বলিতে লাগিল, "মানব-সমিতিকে নোংরা বলে মুখ নোংরা করবেন না বড়বাবু। মানব-সমিতি অতি পবিত্তির জিনিস; আর, তার মধ্যে দিদিমণি দেবতার মতো পবিত্তির।"

সবিস্ময়ে প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি ?"

"'আপনি' বলবেন না দিদিমণি, আমি রেবতীকুমার নাথ, আপনার মানব-সমিতির সভ্য।...অনেকক্ষণই চ'লে যেতাম,

ছিলাম শুধু আপনার হেপাজতে, পাছে আপনাকে কোনো বে-ইজ্জতি সইতে হয়।"

লাঠি আস্ফালিত করিয়া রজনীকান্ত গর্জন করিয়া উঠিল, "হারামজাদা! আমি তোকে এনেছিলাম দিদিমণির হেপাজতের জন্যে?"

"গাল-মন্দ দিয়ো না বড়বাবু। তা হ'লে আবার লাঠি তুলে নোব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিমণির অপমান শোনবার জন্যে আমাকে আন নি।"

তাহার পর ভূমি হইতে নিজের লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "চলুন দিদিমণি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে ঘরে যাই। অনেক সদ্‌বাক্যি আপনি বলেছেন, কিন্তু বুঝেও যে বুঝবে না, তার সঙ্গে তক্কাতক্কি ক'রে কোনো ফল নেই। চলুন।"

উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিল। দুশ্চরিত্রতার জন্য রজনী দাসের উপর মনে মনে যে অপরিমেয় ঘৃণা ছিল, মনের সাধে তাহার ঝাল ঝাড়িয়া প্রতিষ্ঠার মন হালকা হইয়া গিয়াছিল।

পিছন হইতে রজনীকান্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, "তোমাকে আমি দেখে নোব ব'লে দিলাম।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "কাকে দেখে নেবেন? আমাকে?"

কঠোর স্বরে রজনীকান্ত বলিল, "হ্যাঁ, তোমাকে।"

"একান্তই যদি দেখে নেন, পিছন থেকে দেখে নেবেন; তা হ'লে আপনার পক্ষে উপযুক্ত কাজই হবে।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা রেবতীনাথের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

রজনীকান্তর একবার মনে হইল, প্রতিষ্ঠার কাছে ছুটিয়া গিয়া একটা যা-হয় কোনও কাণ্ড করিয়া বসে। তাহার পর কষ্টে সে প্রবৃত্তি দমন করিয়া গণেশের পরিত্যক্ত লাঠিটাও তুলিয়া লইয়া

দাউ দাউ করিয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ক্রোধ যদি সত্যিই অগ্নি হইত তাহা হইলে গৃহে পৌঁছিবার বহু পূর্বেই অন্ততঃ রজনীকান্তর হাতের লাঠি দুইটা ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইত।

আট

ইসমাইলপুরের ঘাটে যখন কবির আহমদের সি-ব্লু স্টীম লঞ্চ ভিড়িল রাত্রি তখন প্রায় পৌনে আটটা। হেমন্তের সূর্য সন্ধ্যা পাঁচটার পূর্বে অস্ত গিয়াছে, সুতরাং পৌনে আটটা কম রাত্রি নহে।

কলিকাতা হইতে রওনা হইবার পূর্বে সুলতান আহমদকে কবির যে চিঠি লিখিয়াছিল, তদনুযায়ী তাহার ঈদের দিন প্রত্যূষে ইসমাইলপুরে পৌঁছিবার কথা। পথে অচিন্তিত কারণে কিছু বিলম্ব ঘটিলেও অপরাহ্ণের পূর্বেই সকলে তাহাকে প্রত্যাশা করিতেছিল। সন্ধ্যার পরও কবির না পৌঁছানোয় সুলতান আহমদ এবং জমিদার-বাড়ির আরও দুই-চারিজন লোক ঘাটে উপস্থিত হইয়া অধীরোদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। দূরে লঞ্চের বংশীধ্বনি শুনিয়া এবং লঞ্চ নিকটে আসিলে তাহার উপর অকাতর দেহে কবিরকে দণ্ডায়মান দেখিয়া সকলে সরবে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল।

তীরে অবতরণ করিয়া কবির সর্বপ্রথম সুলতানকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "ঈদ মোবারক সুলতান!"

হাসিমুখে সুলতান বলিল, "ঈদ মোবারক দাদা!"

তাহার পর সকলের সহিত ঈদের অভিবাদন চালাইতে চালাইতে কবির অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইল।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সর্বজ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কবির বলিল, "আপনারা গান-বাজনা আরম্ভ ক'রে দিন। আমি গোসল ক'রে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।"

বহির্বাটিতে সর্বপ্রশস্ত কক্ষে যথারীতি সঙ্গীতের মজলিস

বসিয়াছে। বীণ, রবাব, তানপুরা, সারেঙ্গী, বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি যন্ত্র সুরে বাঁধা হইয়া আঘাতের অপেক্ষায় মূক হইয়া অবস্থান করিতেছে; গায়ক-গায়িকাগণ পান, তামাক ও আপন আপন গেয় রাগের ধ্যানে মশগুল; আমন্ত্রিত শ্রোতাগণ এক-এক দল বাঁধিয়া নানাপ্রকার আলোচনায় রত। কবিরের উপস্থিতির সহিত সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া রাত দশটা পর্যন্ত চলিবে। তাহার পর খানাপিনার জন্য এক ঘণ্টার বিরতির পর রাত্রি এগারোটা হইতে প্রত্যূষ পর্যন্ত পুনরায় সঙ্গীত চলিবে। সুচিরকাল হইতে ইসমাইলপুর জমিদারভবনে এইরূপ ঈদ উৎসব প্রচলিত আছে।

অন্দর মহলে উপস্থিত হইয়া কবির প্রথমে ফুফুর সহিত অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নাদি করিল; তাহার পর সুলতানকে লইয়া বারান্দায় নির্জন স্থানে একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল, "তোর জন্যে একজন আমার সঙ্গে ঈদের উপহার পাঠিয়েছে সুলতান।"

উৎসুক হইয়া সুলতান জিজ্ঞাসা করিল, "কে দাদা?"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "আন্দাজ কর্ ত?"

সুলতান বলিল, "আলতাফ?"

কবির বলিল, "না।"

"নজীব?"

"না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুলতান বলিল, "সেলিম?"

হাসিমুখে কবির বলিল, "মুসলমান কেউ নয়, হিন্দু।"

"হিন্দু!" আশ্বস্তকণ্ঠে সুলতান বলিল, "ও! বুঝেছি, দীপেন।"

"না।"

হতাশ হইয়া সুলতান বলিল, "তা-ও নয়? তবে কে হিন্দু বন্ধু আমাকে ঈদের উপহার পাঠাতে পারে তা ত বুঝতে পারছি নে!"

কৌতুকস্মিত মুখে কবির বলিল, "তার নামের আদ্য অক্ষর 'প্র'।"

গভীর বিস্ময়ে সুলতান বলিল, "প্র?" একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "প্রদীপ না-কি? কিন্তু প্রদীপের সঙ্গে তো আমার এমন কিছু দোস্তি নেই যে, সে হঠাৎ আমাকে ঈদের উপহার পাঠাতে পারে।"

হাসিমুখে কবির বলিল, "প্রদীপ নিশ্চয় নয়, কারণ সে একটি হিন্দু মেয়ে, যার 'প্র' দিয়ে নাম আরম্ভ।"

কবিরের কথা শুনিয়া সুলতান উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ও! তা হ'লে এতক্ষণ আমাকে পুরুষ নাম বলিয়ে বলিয়ে তামাশা করছিলে? না, কোনো হিন্দু মেয়ের সঙ্গে আমার দোস্তি নেই। 'প্র' দিয়ে নাম আরম্ভ কোনো মেয়ের সঙ্গে তো নেই-ই।"

হাসিমুখে কবির বলিল, "তোর সঙ্গে এ মেয়েরও কোনো দোস্তি নেই সুলতান, কিন্তু তবু সে তোকে ছোট ভাইয়ের মতো মনে করে। সওগাত যা তোর জন্যে পাঠিয়েছে, তা অতি সুমিষ্ট; কিন্তু শুধু চিনি দিয়েই সে সাওগাত মিষ্টি নয়, ভালবাসা দিয়েই প্রধানতঃ মিষ্টি। সত্যিই সে অপরিচিত মেয়ের তোর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ।"

"খোদা কসম?"

"খোদা কসম।"

'প্র'-নামবিশিষ্ট অপরিচিত মেয়ের কথা শুনিয়া একবার সুলতানের প্রতিষ্ঠার কথা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে নিতান্ত মুহূর্তেরই জন্য একবার। ঈদের সওগাত প্রতিষ্ঠা পাঠায় কেমন করিয়াই বা এবং কোথা হইতেই বা?

প্রথমতঃ, যতদূর সুলতান জানে প্রতিষ্ঠা উপস্থিত ঝিঙ্গুরখোলায় আছে আর কবির আহমদ সোজা ইসমাইলপুরে আসিতেছে কলিকাতা হইতে। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠার কলিকাতা যাওয়া এবং সেখানে দৈবক্রমে কবিরের সহিত দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সে সম্ভাবনা

অসম্ভাব্যতার এত কাছাকাছি বস্তু যে, তাহাকে অসম্ভব বলিয়া গণ্য করিলে বিশেষ অন্যায় হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সেই অতি অতর্কিত সাক্ষাৎ একান্তই যদি ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অপ্রত্যাশিত সুষ্ঠু পরিণতির ফলে সুলতানের নিকট প্রতিষ্ঠার প্রেরিত ঈদের সওগাত পৌঁছিবে, ইহাও কম অবিশ্বাস্য ব্যাপার নহে।

কবিরের কথার সোজা উত্তর না দিয়া একটু জেরার ছন্দে সুলতান প্রশ্ন করিল; বলিল, "সে মেয়ে তোমাকেও কি ভালবাসে ?"

হাসিমুখে কবির বলিল, "সে কথা ত সে-ই বলতে পারে। কিন্তু তোর প্রতি আগ্রহের কথা সে ত আমাকে নিজেই বলেছে, নিজহাতে লিখেও দিয়েছে।"

এবার সুলতান অনিশ্চিত জলে ছিপ ফেলিল, বলিল, "সে 'প্র' আদ্যাক্ষরের হিন্দু মেয়ে প্রতিষ্ঠা নয় ত কবির-ভাই ?"

কবিরের মুখে ও কণ্ঠস্বরে কপট বিরক্তির আমেজ দেখা দিল: "তুই ত কম বেতমিজ নোস সুলতান। যার সঙ্গে আমার দুশমনি, তার কাছ থেকে আমি তোর জন্যে ঈদের সওগাত ব'য়ে নিয়ে আসব, এমন কথা তুই ভাবতে পারিস ?"

হাসিমুখে সুলতান বলিল, "পারি বইকি দাদা। যেখানে দুশমনি, সন্ধিও তো সেখানেই। তা ছাড়া, মাধবগঞ্জের মাঠের সেই আশ্চর্য সভা থেকে ফিরে এসে তোমার আমার মধ্যে যে-সব কথা হয়েছিল তাতে ত প্রতিষ্ঠার ওপর তোমার তেমন কিছু দুশমনি দেখা যায় নি ; বরং যেন একটু—" কথা শেষ না করিয়া বোধহয় উপযুক্ত শব্দের অভাববশতঃই সুলতান সহসা থামিয়া গেল।

কবির বলিল, " 'বরং যেন একটু' কি বল্ না; থেমে গেলি কেন ?"

সুলতান বলিল, "বরং যেন একটু কি বলি—কি বলি—এই

ধর, যেন—বরং একটু—শ্রদ্ধা।" বলিয়া সুলতান হাসিয়া উঠিল।

কবির বলিল, "ঠিক বলেছিস সুলতান, দুশমন হ'লেও সে মেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা না জেগে পারে না। সেই মেয়েই তোকে সওগাত পাঠিয়েছে।"

অপরিসীম বিস্ময়ে সুলতান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল ?"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "ঝিঙ্গুরখোলায়, তাদের বাড়িতে। আসবার পথে ঝিঙ্গুরখোলায় নেমে তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

উচ্ছলিত হইয়া উঠিল সুলতান; বলিল, "তা হ'লে তোমার সঙ্গে তার দোস্তি হয়েছে বল !"

কবির বলিল, "দোস্তি বড় শক্ত কথা, দোস্তি হয়েছে কি-না বলতে পারি নে, তবে দুশমনি বোধহয় আর নেই।"

"কই দাও, প্রতিষ্ঠা কি সওগাত পাঠিয়েছে।" বলিয়া সুলতান কবিরের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়াইল।

চেস্টারফিল্ডের বৃহৎ পকেট হইতে সন্দেশের টিনটা বাহির করিয়া সুলতানের হস্তে দিয়া কবির বলিল, "সাবধানে খুলিস। ভেতরে অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ আছে, তার জন্যে সাবধান হতে বলেছি নে; কৌটোর গায়ে যে লেখাটুকু আছে সেইটেই আসল সওগাত।"

কিছু দূরে একটা উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছিল। তাহার তলায় উপস্থিত হইয়া কৌটার উপরের লেখা পড়িয়া সুলতানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কবিরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া সে বলিল, "একটা কথা বলব দাদা ?"

কবির জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

"আচ্ছা, প্রতিষ্ঠা ত অবিবাহিত ?"

কবির বলিল, "হ্যাঁ, অবিবাহিত।" পরে বলিল, "কিন্তু কতকটা।"

গভীর ঔৎসুক্যে সুলতান প্রশ্ন করিল, "কতকটা মানে?"

"সে কথা তুই উপস্থিত না-ই শুনলি!"

এই রহস্যসংবৃত উত্তরে যেন কেমন করিয়া কোথা দিয়া কতকটা দুষ্প্রত্যাশনীয় আশ্বাস লাভ করিয়া সুলতান বলিল, "আচ্ছা, সে কথা না হয় না-ই শুনলাম, কিন্তু আমার কথা তুমি শোন।"

"কি কথা?"

ঈষৎ কঠিন কথাটা কি ভাবে বলিলে খানিকটা মোলায়েম হইবে মনে মনে বোধহয় তাহা একটু ভাবিয়া লইয়া সুলতান বলিল, "তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সেদিন মাধবগঞ্জের হিন্দু-মুসলমানের সভার বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠা প্রথমেই বলেছিলেন—তাঁর আদর্শ হচ্ছে এক ঈশ্বর, এক পৃথিবী, এক মানব জাতি?"

কবির বলিল, "মনে আছে। সে আদর্শ শুধু প্রতিষ্ঠারই নয়, তার মানব-সমিতিরও সেই আদর্শ।"

আর কোন ভণিতা না করিয়া সুলতান আসল কথা পাড়িল; বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তোমার শাদির ত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না?"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "পারে।"

"পারে! কি থাকতে পারে?"

"প্রথমতঃ, আমি শাদি করবই না। তাই যদি করব, তা হ'লে আয়েষার সঙ্গে তোর শাদির কথাবার্তা আরম্ভ করেছি কেন? দ্বিতীয়তঃ, শাদি যদি নিতান্তই করি তা হ'লে আমাদের নিজেদের সমাজে ভাল ভাল মেয়ে থাকতে এক কাফের-মেয়ের সঙ্গে, বিশেষতঃ এক ব্রাহ্মণের কাফের-মেয়ের সঙ্গে শাদি করব কেন?"

বার কয়েক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সুলতান বলিল, "না দাদা, তোমার দ্বিতীয় আপত্তি মনের আপত্তি নয়, মুখের আপত্তি। প্রতিষ্ঠার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাই বল, আর ভালবাসাই বল, যথেষ্ট

না থাকলে কখনই তার প্রতি কাফের-মেয়ে শব্দ তোমার মুখ দিয়ে বার হ'ত না। যার সঙ্গে তোমার দুশমনির শেষ হয়েছে, একটু আগে তাকে দুশমন ব'লে আমার সঙ্গে তামাশা করছিলে; কাফের-মেয়েও তোমার তেমনি তামাশা।"

কবির বলিল, "হয়ত তামাশাই। কত কাফের-মেয়ে আমাদের সমাজে ঘরের বউ হয়ে আসে; তাদের সম্মান মুসলমান বউদের চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। কিন্তু শাদি তো শুধু এক পক্ষের মতে হয় না; দু পক্ষেরই মত চাই। এ ক্ষেত্রে আবার দুই পক্ষেরই অমত।"

সুলতান বলিল, "ও-পক্ষের মত হ'লে এ-পক্ষের মত হতে দেরি হবে না। প্রতিষ্ঠার মতো মেয়ে আমাদের সংসারে এলে আমাদের সংসারের জেল্লা বেড়ে যাবে। তাকে আমার ভাবী করবার চেষ্টায় একবার আড়েহাতে লাগব।"

সুলতানের মতলব শুনিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কবির বলিল, "খবরদার ভাই সুলতান, খবরদার খবরদার প্রতিষ্ঠার কাছে এ কথা পাড়িস নে। দুঃখ নেই তোর প্রতিষ্ঠা তোর ভাবীই হবে; তবে আমাকে দিয়ে নয়।"

ঔৎসুক্য-ব্যগ্র কণ্ঠে সুলতান জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কাকে দিয়ে?"

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া কবির বলিল, "তোর চিত্তদাদাকে দিয়ে। চিত্ত আর প্রতিষ্ঠা বিয়ের চুক্তিতে বাঁধা।"

"পাকা চুক্তি?"

"হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, পাকা চুক্তি। চুক্তি আবার কাঁচা হয় নাকি?"

"হয় বই কি। কত চুক্তি হামেশা কাঁচা হয়ে যাচ্ছে।"

"অমানুষের চুক্তি কাঁচা হয়ে যায়; চিত্তনাথ-প্রতিষ্ঠার মতো মানুষের চুক্তি কাঁচায় না।" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া কবির বলিল "তবলার চাঁটি শোনা যাচ্ছে, তুই মজলিসে গিয়ে ব'স্; গোসল সেরে আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে আসছি।"

সুলতান বলিল, "আমার কিন্তু পনেরো মিনিটের চেয়েও দেরি হ'তে পারে দাদা।"

"কেন? কি জন্যে?"

"কৌটোটা সাবধানে খুলতে তো সময় লাগবে।"

"তা ব'লে পনেরো মিনিট? প্রতিষ্ঠা-ভাবীর উদ্দেশে একখানা কবিতাও লিখতে হবে না-কি রে?"

সুলতান বলিল, "ক্ষেপেছ! হোমিওপ্যাথিক ভাবীর উদ্দেশে কবিতা সহজে বেরোয় কখনো?"

"তোর অদৃষ্টে যখন অ্যালোপ্যাথিক ভাবী নেই, কি আর করবি তখন! তবে প্রতিষ্ঠা হোমিওপ্যাথিক ভাবী হ'লেও হাই ডাইলিউশনের হোমিওপ্যাথিক ভাবী।" বলিয়া কবির হাসিয়া উঠিল।

"দিদি-প্রতিষ্ঠা কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক দিদি, যাকে উদ্দেশ ক'রে কবিতা লেখা হয়ত শক্ত হবে না।" বলিয়া সুলতান তাহার বসিবার ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

কবিরও অ্যালোপ্যাথিক-হোমিওপ্যাথিকের মিশ্রিত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গোসলখানার দিকে অগ্রসর হইল।

নয়

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিয়া মুখে-চোখে জল দিয়া একটা হালকা গরম গাত্রবস্ত্র গায়ে জড়াইয়া প্রতিষ্ঠা বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, —দূর হইতে দেখিতে পাইয়া শৈলনন্দিনী ছুটিয়া আসিল।

"কোথায় যাচ্ছিস পিতু ?"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "একটু ঘুরে আসি মা "

"কোথায়, তাই ত জিজ্ঞাসা করছি।"

"একবার অজিতদের বাড়ি যাব। শুনেছিলাম তার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, তাকে দেখে আসব। আর তার সঙ্গে কথাও আছে একটু।"

"আর, তারপর অজিতকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যত হাড়ী ডোম চামারের ঘরে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াবি ত ?"

"হাড়ী ডোম চামার বলছ কেন মা ? তারা আমাদের মানব-সমিতির সদস্য আর অসদস্য। কিন্তু বেশীদিন লাগবে না মা, অসদস্যরা বেশ তাড়াতাড়িই সদস্য হয়ে আসছে।"

শৈলনন্দিনী বলিল, "খুব ভাল করছে। দুধ জ্বাল দেওয়া হয়ে গেছে, এক বাটি দুধ খেয়ে তারপর তুমি অসদস্যদের সদস্য করবার কাজে বেরিয়ো। ফিরতে ত সেই বেলা বারোটা।"

দুধ খাইবার প্রস্তাবে মুখ-চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "দুধ খেতে আমার ভাল লাগে না মা ; কলকাতার জোলো দুধ বরং খাওয়া যেত ; এখানকার ঘরের গরুর গাঢ় দুধের মিষ্টি স্বাদে গা যেন কেমন ঘুলিয়ে ওঠে। তার চেয়ে তুমি অরবিন্দকে ভাল ক'রে দুধ খাওয়াও। ওর শরীর দেখেছ, দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে ?"

ঈষৎ বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে শৈলনন্দিনী বলিল, "আর, তোমার শরীর দিন দিন ফুলে উঠছে—না? লেখা-পড়া শেষ ক'রে মামার বাড়ি থেকে যখন এলি, কি চমৎকার শ্রী নিয়ে এসেছিলি। দেখতে দেখতে মাস ছয়েকে সে শ্রী মিলিয়ে যেতে বসেছে। দিন নেই, রাত্রি নেই, সময় নেই, রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হটর-হটর ক'রে ঘুরে বেড়ালে দেহ কখনো থাকে?"

তাহার পর কন্যার সেই অনুশোচিত দেহেরই অপরূপ লাবণ্যের প্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একটা কথা মনে করিয়া শৈলনন্দিনী বলিল, "হ্যাঁ রে পিতু, কলকাতা থেকে এসে প্রথম প্রথম বই-টই নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করতিস। কি যেন একটা লিখছিলি?"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "থিসিস।"

"হ্যাঁ। সে-সব চর্চা ত একেবারে বন্ধ করেছিস।"

"মানুষ নিয়ে এ চর্চার কাছে সে চর্চা আর ভাল লাগে না মা। এ ফেলে রেখে আর কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না। একটা কোনো ব্রত অথবা পূজো করতে হ'লে প্রথমে যেমন একটা সঙ্কল্পের অনুষ্ঠান করতে হয়, আমাদের মানব-সমিতিও তেমনি বিশ্ব-মানবসমাজ গড়বার মহাব্রতের প্রথম সঙ্কল্প অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে ইংরিজী সাহিত্যের থিসিস লেখার তুলনাই হয় না।"

শৈলনন্দিনী বলিল, "হয় না, তা আমিও জানি। কিন্তু অত লেখাপড়া-জানা মানুষ চিত্তনাথ, লেখাপড়া অত ভালবাসেন, তোর লেখাপড়ায় যত্ন উনি নিশ্চয় পছন্দ করেন।"

প্রতিষ্ঠা উত্তর দিল, "তা হয়ত করেন, কিন্তু এ কথাও আমার জানতে বাকি নেই মা, উনি যদি তোমার মেয়েকে পছন্দ ক'রে থাকেন ত তার সামান্য লেখাপড়ার জন্যে করেন নি, করেছেন সে তাঁর বন্ধু অনিরুদ্ধের ছোট বোন ব'লে। মানব-সমিতিতে তাঁর উৎসাহ কম নয়, তিনি মানব-সমিতির দুই নম্বর সদস্য। কিন্তু এ

সবই ত তোমার জানা কথা, এ সব কথার আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করবার কোনো দরকার নেই। আমি মুখ ধুয়ে আসছি, তুমি দুধের বাটি টেবিলের ওপর রেখে দাও। কিন্তু লক্ষ্মী মা—" ডান হাতের তর্জনীর আধখানা দেখাইয়া বলিল, "আধ বাটি।"

শৈলনন্দিনী বলিল, "আমার কিন্তু অনেক রকম মাপের বাটি আছে পিতু। তা হ'লে মানদা-ঠাকুরঝি পুরী থেকে এসে যে বাটিটা আমাকে দিয়েছিলেন তার আধ বাটি দুধ আনি?"

ব্যস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "দোহাই মা, সে ত পুরো এক সেরী বাটি! তুমি যে বাটিতে আমাকে দুধ দাও তাইতেই দিয়ো।" তাহার পর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, তুমি যে আমাদের এত দুধ খাওয়াচ্ছ, তোমার নন্দিনী আজকাল কত দুধ দিচ্ছে?"

শৈলনন্দিনী বলিল, "খুব বেশী নয়। দু বেলায় প্রায় তিন সের।"

"এ থেকে সামান্য একটু পাড়ার দুঃস্থ শিশুদের জন্যে দেওয়া যায় না মা?"

একটু ভাবিয়া শৈলনন্দিনী বলিল, "তোমার বাবার প্রধান আহার দুধ। তারপর তোমরা দু ভাই-বোন আছ, এ থেকে দেওয়া সুবিধে হবে না। তবে মাঘ মাসে সুরভি বিয়োলে অন্ততঃ সের দেড়েক দুধ তোমাকে দিতে পারব।"

প্রসন্নমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "সের দেড়েক অন্ততঃ গুটিছয়েক শিশুকে কিছু কিছু খাওয়ানো চলবে।" বলিয়া সে মুখ ধুইতে প্রস্থান করিল।

দশ

অজিতদের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা দেখিল, তখনও অজিত লেপ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছে।

তাহাকে না জাগাইয়া সন্তর্পণে বাহিরে আসিতেই বারান্দায় দেখা হইল অজিতের মাতা ভুবনমোহিনীর সহিত।

প্রতিষ্ঠাকে দেখিয়া হাসিমুখে ভুবনমোহিনী বলিল, "কখন এলি পিতু?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "এই মাত্র। অজিতের কি হয়েছে মাসিমা?"

ভুবনমোহিনী বলিল, "পরশু থেকে সামান্য জ্বর হয়েছে। আজ সকালে গা দেখে মনে হ'ল, জ্বরটা ছেড়েছে। আজই তোর কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত। উনি বেবোবার সময়ে মানা ক'রে গেছেন, তাই আবাব লেপ গায়ে দিয়ে শুয়েছে।"

ঘরের ভিতরে অজিতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "দিদি কখন এলে?"

ভুবনমোহিনীর সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা দেখিল, লেপ সরাইয়া দিয়া অজিত খাটের উপর বসিয়া আছে।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "ঘুম ভেঙে গেল অজিত?"

অজিত বলিল, "ঘুমুই নি ত দিদি, চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম।"

"আমি একটু আগে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, টের পাও নি?"

মাথা নাড়িয়া অজিত বলিল, "না, টের পাই নি। তুমি এসেছ টের পেলে কি চোখ বুজে শুয়ে থাকি?"

অজিতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার কপালে ও পাঁজরায় হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না মাসিমা, জ্বর এখনো

একেবারে ছাড়ে নি ; তবে আজ বিকেলের দিকে ছেড়ে যাবার সম্ভাবনা।" তাহার পর অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই জ্বরগায়ে আমার কাছে যেতে চাচ্ছিলে অজিত ?"

হাসিমুখে অজিত বলিল, "তোমার কাছে গেলে জ্বর ছেড়ে যেত দিদি।"

ভুবনমোহিনী বলিল, "শোন একবার ছেলের কথা! জ্বর ছেড়ে যেত! তবে তোমাকে যে-রকম ভক্তি করে, ছেড়ে গেলে আশ্চর্যের কিছু হ'ত না।"

প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত বলিল, "তোমাকে আমি শুধু ভক্তি করি দিদি ?—ভালবাসি নে ?"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি ত জানি ভাই, তুমি আমাকে ভালই বাস। শুধু ভক্তি করলে আমার কথায় কি অমন ক'রে প্রাণের ভয় তুচ্ছ ক'রে মালিনীকে ঐ দুর্বৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারতে ?"

অজিত বলিল, "ঠিক।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি কবির আহমদ এসেছিলেন অজিত।"

আনন্দোচ্ছল মুখে অজিত বলিল, "এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, আজ বিকেলেও আসবেন।"

"কি চমৎকার! বন্ধুভাবেই আসছেন নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ, বন্ধুভাবেই।"

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কবির আহমদ আমাদের জমিদার ত ?"

উত্তর দিল অজিত। বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের জমিদার।"

তারপর প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সব কথা ভাল ক'রে বল দিদি।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "তুমি সুস্থ থাকলে তোমাকে আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত থাকতে বলতাম অজিত।"

ব্যগ্রকণ্ঠে অজিত বলিল, "না না, দিদি। সে সময়ে সেখানে কারও থাকা উচিত হবে না। তোমার সঙ্গে নির্জনে কথাবার্তা হওয়া দরকার। কালকের কথা বল, শুনি।"

মোটামুটি প্রতিষ্ঠা গত রাত্রের সকল কথাই বিবৃত করিল, বোধহয় অনাবশ্যকবোধে বলিল না শুধু রজনী দাসের কথা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথাও অপ্রকাশিত রহিল না। অজিতের পিতা হরলাল মিত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অজিতের ঘরে প্রতিষ্ঠাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, "এই যে প্রতিষ্ঠা মা এখানে রয়েছ! ওদিকে সারা গ্রাম আজ তোমার কথায় তোলপাড়!"

সকৌতূহলে ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা? কিসের জন্যে?"

হরলাল বলিল, "এক অদ্ভুত কাহিনী,—রেবতীনাথ বলছে, আর উৎসাহে লাফাচ্ছে। কাল রাত্রে গভীর অন্ধকারের মধ্যে নির্জন নদীপথে প্রতিষ্ঠা মা ঝিঙ্গুরখোলার ত্রাস পাপিষ্ঠ রজনী দাসকে সাঙ্ঘাতিকভাবে ঘায়েল করেছেন।"

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে ভুবনমোহিনী বলিল, "ও মা, সে কি কথা গো! আমাদের পিতু ঐ গুণ্ডা রজনী দাসকে ঘায়েল করেছে? কি দিয়ে ঘায়েল করেছে?"

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হরলাল বলিল, "কোনো লোহার অস্ত্র দিয়ে নয়, লোহার চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক বাক্য-শরাঘাতে। তা হ'লে রেবতীনাথের কাছে যেমন শুনলাম, গল্পটা বলি শোন।"

অজিতের শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হরলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি তা হ'লে আসি মেসোমশায়। বাবা কাল পৈতেডাঙ্গা থেকে আসেন নি, সেইজন্যে আমরা একটু চিন্তিত আছি। দেখি উনি এলেন কি না।"

সহাস্যমুখে হরলাল বলিল, " সে জন্যে নয় মা। নিজের জমিতে গেছেন, কার্যগতিকে দেরি হচ্ছে,— সে জন্যে নয়। আসলে তুমি নিজের কীর্তি নিজের কানে শুনতে চাও না ব'লে পালাচ্ছ। কিন্তু একটা কথা মা, কয়েক দিন একটু সাবধানে সাবধানে থেকো। শুনেছি পাপিষ্ঠটা দল পাকাবার চেষ্টা করছে। অবশ্য কোন সৎ লোকই ওর দলে যোগ দেবে না; কিন্তু মদে আর অর্থে বশীভূত হয় এমন অসৎ লোকও ত গ্রামে আছে। যে ঘা রজনীকে দিয়েছ, তা শুকোতে যে-কয়েক দিন লাগে, একটু সাবধানে থেকো।"

ঘাড় নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা-বলিল, "থাকব।" তাহার পর অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "চললাম ভাই অজিত, গা নাড়া দিয়ো না, একটু সাবধানে থেকো।"

অজিত বলিল, "ভারি দুঃখ হচ্ছে দিদি, অসুখে প'ড়ে রয়েছি। নইলে আজ আমাদের 'দুয়োর দল' বার ক'রে সারা গ্রামটা সরগরম ক'রে তুলতাম।"

স্মিতমুখে অল্প মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না অজিত, আজ ত আমাদের দুয়ো দেবার দিন নয়।"

সবিস্ময়ে অজিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, " 'দুয়ো হেরে গেল'—এ কথা ত আমরা কাউকে বলি নে। পরাজিত শত্রুকে উপহাস করা উচিত নয়।"

"কিন্তু এ পরাজিত শত্রু যে আবার দল পাকাবার চেষ্টা করছে!"

"ও কিছু নয়; ঐ রকম ক'রে পরাজয়টা পরিপাক করবার সময় নিচ্ছে। আবার যদি কখনো সত্যি-সত্যিই দল বেঁধে ওঠে, তখন আমাদের 'দুয়োর দল' ব'লে বেড়াবে—দুয়ো! হেরে গিয়েও আক্কেল হয় না!"

হরলাল বলিল, "তোমাদের 'দুয়োর দল' আছে তো জানি, কিন্তু 'দুয়োর দলে'র কি ফাংশান তা ঠিক জানি নে।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "ও আমাদের ছোট ছেলেদের একটা ব্যাপার। যারা কোনো রকম অন্যায় কাজ করে—যারা পরের পুকুরের মাছ তুলে নেয়, পরের জমির ধান কেটে আনে, যারা প্রতিবেশীর জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় থাকে—এই ভাবে যারা কোনো-না-কোনো রকম অসামাজিক আচরণ করে, আমাদের 'তুয়োর দল' গ্রামের পথে পথে ঘুরে তুয়ো দিয়ে দিয়ে তাদের লজ্জা দিয়ে বেড়ায়। এ কৌশলের দ্বারা আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু শুভবুদ্ধি জাগাতে পেরেছি।"

প্রসন্নমুখে হরলাল কহিল, "ভারি চমৎকার কৌশল ত! আমার মনে হয় মা, কালক্রমে তোমার এ 'তুয়োর দল' একটা প্রবল শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।"

মৃদু হাসির দ্বারা সে কথার উত্তর দিয়া ভুবনমোহিনীর দিকে চাহিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "চলি মাসিমা।"

"এস মা, এস।" বলিয়া ভুবনমোহিনী প্রতিষ্ঠাকে সদর দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিল।

পথে পড়িয়া খানিকটা পরেই বাম দিকে কাশীনাথ স্মৃতিরত্নের বাড়ি। বৃদ্ধ স্মৃতিরত্ন তখন তাহার বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নূতন খেজুর-গুড় কিনিতেছিল। প্রতিষ্ঠাকে দেখিতে পাইয়া ডান হাত তুলিয়া উৎফুল্ল মুখে আগাইয়া আসিল।

প্রতিষ্ঠাও স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া মস্তক অবনত করিল।

পরম স্নেহভরে প্রতিষ্ঠার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া স্মৃতিরত্ন বলিল, "সব কথা শুনেছি মা, আনন্দে মন ভ'রে আছে। দানবদলনীরূপে তুমি আমাদের গ্রামকে পশুশক্তির হাত থেকে আর সকল প্রকার অনাচার থেকে মুক্ত কর—সর্বান্তঃকরণে এই আশীর্বাদ করি। তোমার অপূর্ব সুন্দর মূর্তির মধ্যে মহামায়ার ঐশ্বর্য দেখতে পাচ্ছি।"

নত হইয়া কাশীনাথের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া নম্রকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আপনি নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে এই আশীর্বাদ করুন স্মৃতিরত্ন মশায়, আমাদের মানব-সমিতি যেন দানবের দলন না ক'রে দানবকে মানুষ ক'রে তুলতে পারে।"

সহাস্যমুখে স্মৃতিরত্ন কহিল, "সেই আশীর্বাদই করেছি মা। দানবকে মানব করতে হ'লে প্রথমে দলনই করতে হবে। সোনাকে খাদমুক্ত করতে হ'লে তাকে না গলিয়ে উপায় নেই।"

"আচ্ছা, আসি স্মৃতিরত্ন মশায়।"

"এস। আর দেখ, এই মাস থেকে আমাকে তোমার মানব-সমিতির সদস্য ক'রে নিয়ো। আমি তোমাদের সমিতির সকল বিধি-নিয়মের বশীভূত হয়ে চলব।"

আর একবার কাশীনাথ স্মৃতিরত্নের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উৎফুল্ল মুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি হাতে হাতে আপনার আশীর্বাদের প্রথম আর বোধহয় শ্রেষ্ঠ ফল পেলাম। আপনার মত মহৎ ব্যক্তিরা সদস্য হ'লে দেখতে দেখতে আমাদের সমিতি সর্বজনমান্য হয়ে উঠবে। আচ্ছা, আসি তা হ'লে।"

"এস মা, এস।"

খানিক দূর অগ্রসর হইয়া প্রতিষ্ঠা দেখিল, বিপরীত দিক হইতে কেশব আসিতেছে। কেশব মিত্র—তাহার বাল্য-বান্ধবী সুরমার বড়দাদা।

কেশব নিকটে আসিলে হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন কেশবদাদা?"

রুষ্ট মুখে কেশব বলিল, "ভাল তুমি থাকতে দিলে কই?"

"কেন বলুন ত?"

"তুমি সুরমার বন্ধু, তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, মানব-সমিতি দিয়ে সকলের কান কেটে বেড়ালে তুমি বিপদে পড়বে।"

কেশব যে গত রাত্রের ঘটনা মনে করিয়া মন্তব্য করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সহজ স্বরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি ত কারো কান কাটি নে কেশবদাদা, যাদের কান একটু অতিরিক্ত লম্বা তাদের সেই অতিরিক্ত অংশটুকু ছেঁটে দিয়ে উপকার করবারই চেষ্টা করি।"

প্রতিষ্ঠার এই শ্লেষমিশ্রিত বাক্য শুনিয়া যে ধৈর্যটুকু কেশব কোনমতে রক্ষা করিতেছিল, তাহা নিঃশেষে হারাইল। আরক্ত নেত্রে কঠোর কণ্ঠে বলিল, "রজনী দাস তোমার নাক কেটে দেবে।"

তেমনই সহজ স্বরে প্রতিষ্ঠা উত্তর দিল, "পারলে নিশ্চয় দেবেন। কিন্তু আপনার ভয় নেই কেশবদাদা, কাল রাত্রে ওঁর যে মুরদ দেখেছি, নাক কাটবার শক্তি নেই ওঁর। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। রজনী দাসের বিধবা ভাদ্রবউ মালিনী-বউদিদি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা কি আপনি সমর্থন করেন না ?"

"না।"

"করেন না! কেন বলুন ত ?"

কেশব বলিল, "একজন হিন্দু বিধবাকে মুসলমানের হাতে তুলে দিলে কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না।"

কিন্তু একজন অসহায় হিন্দু বিধবাকে তার দুশ্চরিত্র ভাসুরের অত্যাচারের ওপর বেঁধে রেখে তাকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবার কারণ ঘটালে সে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় ত ?"

"হ্যাঁ, তবু সে সমাধান ঘরুয়া সমাধান।"

তিক্তকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আপনার ঘর এত নোংরা, এত সঙ্কীর্ণ কেশবদাদা ?"

কেশবও তীক্ষ্ণ রুষ্টকণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমার নোংরা সঙ্কীর্ণ ঘরে কবির আহমদের স্থান নেই, তা তোমার ঘরে সেঁদিয়ে সে যত

কৃপাই করুক না কেন। তবে একটা কথা তোমাকে জানাই। রজনী দাসের প্রতি তোমার এত ঘৃণা, সে কিন্তু একদিন তোমার একটা মস্ত উপকার করবে।”

“কি, শুনি?”

“কবির আহমদের উপপত্নী হওয়া থেকে তোমাকে রক্ষা ক’রে রতন চৌধুরীর হাতে সঁ’পে দেবে। উপপত্নী যদি হ’তেই হয়, তা হ’লে মুসলমানের উপপত্নী হওয়ার চেয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণের উপপত্নী হওয়া অনেক ভাল। রতন চৌধুরী অতিশয় পরাক্রান্ত আর জেদী লোক। কলকাতা থেকেই ও তোমার প্রতি লালায়িত হয়ে আছে—সে কথা তুমি নিজেই জান। ওর হাত থেকে তোমার রক্ষে নেই। তুমি যদি রাজী হও তোমাকে বিয়ে ক’রে বরণ নেবে, আর রাজী যদি না হও লাঠির চোটে হরণ ক’রে নেবে। এখন বরণ আর হরণ—দুয়ের মধ্যে যা হয় একটা বেছে নিতে হবে তোমাকে।”

প্রতিষ্ঠা বলিল, “একান্তই যদি কোনদিন সে সঙ্কট উপস্থিত হয়, তা হ’লে বরং হরণ বেছে নোব, তবু বরণ নয়। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কেশবদাদা, আপনি কি সত্যি-সত্যিই রতন চৌধুরীর দলের লোক?”

কেশব বলিল, “আমি কোন্ দলের লোক সে খবরে তোমার কোনো দরকার নেই। তবে তুমি এ খবরটুকু জেনে রাখ, আমাদের এই ঝিঙ্গুরখোলাতেই অন্ততঃ জন পঞ্চাশেক তাগড়া হিন্দু মুসলমান আছে, যারা রতন চৌধুরীর অর্থ দিয়ে কেনা, আর যাদের দলপতি হচ্ছে ঐ ভীষণ ড্রিল-মাস্টার রজনী দাস।”

“আচ্ছা, আসি। আমার সময়ের মূল্য যে খুব বেশী তা বলছি নে; তা ব’লে এত কমও নয়, যাতে ঐ কদর্য রতন চৌধুরী আর গুণ্ডা রজনী দাসের আলোচনায় আর বেশী নষ্ট করি।” বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রস্থান করিল।

বাড়ির কাছে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। দেখিল, সম্মুখে জন পাঁচ-ছয় কিশোর বালকের একটি দল হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

দলটি নিকটে আসিতে প্রসন্নমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কি রে, কি খবর?"

দলের মধ্যে যে বালকটি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহার নাম ওসমান। উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, "সুখবর দিদি। আজ সকালে সামান্য একটা চক্কোর মেরে আমরা ন'জন নতুন সদস্য ক'রে এসেছি। যার কাছে যাই, সে-ই খুশী। বলে—অসুর নিপাত হয়েছে, নিশ্চয় সদস্য হব।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "অসুর নিপাত কি রে ওসমান? অসুর ত আমাকে হরণ করবার জন্যে কোমর বাঁধছে।"

"তোমাকে হরণ করবার জন্যে কোমর বাঁধছে?—বল ত এখনি গিয়ে অসুরের হরণ করবার দুটি হাত ভেঙে দিয়ে আসি।"

ওসমানের কৌতুকাবহ প্রস্তাবের সমর্থনে অবশিষ্ট বালকেরা উৎসাহভরে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এখনি গিয়ে—এখনি গিয়ে।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "দূর পাগলারা! হাত কখনো ভাঙতে আছে রে? একদিন দেখবি অসুরের ঐ দুটো হাত আমাদের মানব-সমিতির ঘর-বাঁধার কাজে লেগে গেছে। কিন্তু এসব কথা তোরা শুনলি কার কাছে?"

এবার কথা কহিল সোমনাথ; বলিল, "রেবতীনাথের কাছে। সকালে উঠে রেবতী পেটে একটু লালপানি পুরে সারাগ্রাম নেচে নেচে এই সব কথা বলে বেড়াচ্ছে। আমরা তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম দিদি। এখন যাব, না, ওবেলা আসব?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "না ভাই, বেলা হয়ে গেছে, এখন আর নয়; ও-বেলাও আমি একটু ব্যস্ত থাকব। কাল সকালে তোরা আসিস।"

"বেশ কথা।" বলিয়া ছেলের দল আগাইয়া গেল।

এইরূপে পথে নিন্দা সুখ্যাতি কুড়াইতে কুড়াইতে প্রতিষ্ঠা যখন গৃহে পৌঁছিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

শৈলনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া ঔৎসুক্যভরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবা এসেছেন?"

শৈলনন্দিনী বলিল, "না আসেন নি। হরি কৈবর্ত এসে ব'লে গেল ভাল আছেন। দিবাকর দাসের জমির ধানের বিবাদ নিয়ে আটকে পড়েছেন। আজ বিকেলে কিংবা কাল সকালে আসবেন। কিন্তু কি কাণ্ড বল্ ত পিতু!"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কি কাণ্ড মা?"

"কাল রাত্রে রজনী দাসকে নিয়ে ঐ সব কাণ্ড করেছিস, আর আমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিস নি?"

"তোমাকে কে বললে মা?"

"কেন, পরে পরে পাঁচ-সাত জন এসে ব'লে গেল।"

"তারা কি মতামত প্রকাশ করলে?"

"কেউ করলে তোর সৎসাহসের সুখ্যাতি, কেউ বা করলে তোর দুঃসাহসের নিন্দে।"

স্মিতমুখে আবদারের সুরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "তুমি আমার কাজের সমর্থন কর মা, তা হ'লে আমার সৎসাহস চতুর্গুণ বেড়ে যাবে।"

অদূরে অরবিন্দ বসিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ ময়না পাখির পরিচর্যা করিতেছিল। সে বলিল, "মা ত সমর্থন করবেনই, আমিও তোমার কাজের সমর্থন করছি দিদি।"

সহাস্যমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "ধন্যবাদ ভাই অরবিন্দ। আমরা দু ভাই-বোন যখন—"

প্রতিষ্ঠাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া খাঁচার ভিতরে ময়না সহসা সজোরে ডাকিয়া উঠিল, "পিতু, পিতু, পিতু!"

অরবিন্দ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এই দেখ দিদি, চুনিও তোমাকে সমর্থন করছে।"

এমন সময়ে ময়না-চুনির সমর্থন নিমজ্জিত করিয়া অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ঘটনার সূত্রপাত হইল। অঙ্গন হইতে বাহির হইবার দ্বারে সজোরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত বিকৃত কণ্ঠে ডাক, "মা মেনকা, দোর খোল মা।"

মা মেনকা! এ আবার কি ব্যাপার? পাখি ছাড়িয়া অরবিন্দ দ্বারের দিকে ছুটিল; শৈলনন্দিনী এবং প্রতিষ্ঠাও প্রগাঢ় কৌতূহলে তাহার পিছনে পিছনে বারান্দা হইতে অঙ্গনে নামিয়া আসিল।

আবার সজোরে কড়া নাড়া এবং গভীর বিকৃত কণ্ঠে ডাক—"মা মেনকা, দয়া ক'রে দেখা দাও মা!"

হড়াৎ করিয়া অরবিন্দ অর্গল খুলিয়া ফেলিল, এবং প্রায় তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এক বৃহৎ বলিষ্ঠদেহের মানুষ। তাহার পর অদূরে শৈলনন্দিনীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই পা জড়াইয়া পায়ের উপর মাথা ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিল, "এতদিন চিনতে পারি নি তোমাকে মা মেনকা! অপরাধ নিয়ো না মা, ক্ষমা ক'রো।"

রেবতীনাথ।

যৎপরোনাস্তি বিব্রত হইয়া শৈলনন্দিনী বলিতে লাগিল, "আঃ! পা ছাড় রেবতী। কি গেরো! আমি মা-মেনকা হতে যাব কেন?"

তেমনই মুখ ঘষিতে ঘষিতে রেবতী বলিতে লাগিল, "ছলনা ক'রো না মা। তুমি মা মেনকা। কাল রাত্রে তোমার কন্যে দানবদলনী দুর্গাকে দেখে চিনেছি, তুমি মেনকা। ওঃ! রজনী-দানবের দলনটা যদি নিজের চোখে দেখতে!"

সমস্যার সমাধান হইল। সকালে উঠিয়া যে তরল পদার্থটুকু রেবতী পাকাশয়ে চালান দিয়াছিল, তাহা সময়ের আলোড়নে এবং রৌদ্রের উত্তাপে বাষ্পীয় আকার ধারণ করিয়া মস্তিষ্কে তুরীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। এবং সেই তুরীয় অবস্থায় প্রতিষ্ঠাকে দনুজদলনী দুর্গা মনে হওয়া মাত্র অনিবার্য যুক্তির দ্বারা মেনকা মনে হইয়াছিল শৈলনন্দিনীকে।

অপাঙ্গে একবার কন্যার দিকে চাহিয়া দেখিয়া শৈলনন্দিনীর মনে হইল পরিপক্ক হেমন্তের রৌদ্র-ঝলমল অঙ্গনে অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়া যেন দানবদলন দুর্গাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, তাহার নাম শৈলনন্দিনী না হইয়া প্রতিষ্ঠার নাম হইলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত।

"আঃ! পা ছাড় রেবতী।"

শৈলনন্দিনীর পদদ্বয়ে তেমনই নাক ঘষিতে ঘষিতে রেবতী বলিল, "যতক্ষণ না স্বীকার যাবে তুমি মেনকা, ততক্ষণ তোমার দু পা জড়িয়ে প'ড়ে থাকব।"

উদ্ধারের উপায় পাইয়া শৈলনন্দিনী বলিল, "হ্যাঁ, স্বীকার যাচ্ছি —আমি মেনকা; পা ছাড়।"

শৈলনন্দিনীর পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া উৎফুল্ল মুখে রেবতী বলিল, "এই যে মা, ভুবন আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস!" তাহার পর দুই হাত জুড়িয়া পর্যায়ক্রমে ডান পা ও বাঁ পা তুলিয়া মাটিতে ফেলিতে ফেলিতে বেসুরা কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে চৈতন্যদায়িনী,—
শৈলসুতা মা গো ত্রিভুবনতারিণী।
সৃজন-পালন-লয় যাহার কটাক্ষে হয়,
নমস্তে মহেশজায়ে—

তাহার পর সহসা জিভ কাটিয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল, "মহেশজায়ে কি ক'রে হবে ? এখনো যে কুমারী উমা।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "রেবতী, উঠোনে বোস।"

"যতক্ষণ না একটা কথার ফয়সলা হচ্ছে, কিছুতেই বসব না।" বলিয়া রেবতী ডান হাত দিয়া তাহার বাম বাহুতে তাল ঠুকিল।

"কি কথা ?"

"আশ্বিন মাসে যে জগত্তারিণী ঘরে ঘরে এসেছিল, সে তুই কি না ?"

কোমল-কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "হ্যাঁ রেবতী, সে আমিই।"

"এতক্ষণ এই কথাটা বললেই ত চুকে যেত।" বলিয়া বসিয়া পড়িয়া জলের বালতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রেবতী বলিল, "নাও, কি করবে কর। মাথায় জল ঢালবে ত ?"

প্রতিষ্ঠার উপদেশে অরবিন্দ এক বালতি জল ও ঘটি আনিয়া রাখিয়াছিল। কয়েক ঘটি জল রেবতীর মাথায় ঢালিয়া একটা গামছা তাহার হাতে দিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "নাও, মাথাটা ভাল ক'রে মুছে ফেল।"

বাধ্য শিশুর মত রেবতী প্রতিষ্ঠার আদেশ পালন করিতেছিল।

এক পেয়ালা দুধ ও একটা রেকাবিতে দুইটা মুড়ির মোয়া লইয়া উপস্থিত হইয়া শৈলনন্দিনী বলিল, "একটু দুধ খাও রেবতী। শরীরটা একটু সুস্থ হবে। আচ্ছা, সাত-সকালে উঠে ও-ছাইভস্ম গিলেছিলে কেন বল ত ?"

রেবতী বলিল, "আনন্দে মা জননী, আনন্দে। সকালে উঠে যখন কাল রেতের কথা মনে হ'ল, একটু বোতল-উচ্ছোব ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লাম। ও পদাত্থো পেটে একটু না থাকলে অমন ক'রে কি জয়গান ক'রে বেড়াতে পারতাম ? এক রকম ভালই ত ছিলাম, আপনার বাড়ি নজরে পড়তেই মনটা একেবারে নেচে উঠল। আচ্ছা, আসি এখন।"

"শরীর ভাল হয়েছে ? একা যেতে পারবে ?—না, সঙ্গে কাউকে দেব ?"

"কাউকে দিতে হবে না মা, অনায়াসে যেতে পারব।" বলিয়া শৈলনন্দিনীকে প্রণাম করিয়া রেবতী প্রস্থান করিল।

এগার

হেমন্তের সংক্ষিপ্ত অপরাহ্ণ বেলা তিনটা হইতেই ঝিমাইতে আরম্ভ করে।

প্রতিষ্ঠাদের বহিরঙ্গণের কদমগাছতলায় রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া প্রতিষ্ঠা একটা পুস্তক পড়িতেছিল, এমন সময়ে রসরাজ তরফদার উপস্থিত হইল।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আসুন তরফদার মশায়, বসুন।"

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া রসরাজ বলিল, "কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না, তুমি বসবে কিসে?"

"আপনি বসুন। আমার জন্যে আর একটা চেয়ার আনছি।"

অদূরে বিনোদ কুমড়াগাছের একটা মাচা মেরামত করিতেছিল; তাহাকে ডাকিয়া প্রতিষ্ঠা গৃহের ভিতর হইতে আর একটা চেয়ার আনিবার আদেশ দিল।

বিনোদ জাতিতে গোয়ালা। সে প্রতিষ্ঠাদের গো-সেবা এবং গৃহপরিচর্যা—দুই কাজই করে।

চেয়ার আসিলে প্রতিষ্ঠা উপবেশন করিলে রসরাজ বলিল, "বাঁড়ুজ্জে মশায় এখনো পৈতেডাঙ্গা থেকে আসেন নি?"

"না। আজ বিকেলে কিংবা কাল সকালে আসবেন।"

"আসেন নি তা জানি। তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ ছিল। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম তুমি ব'সে আছ। ভাবলাম, পরামর্শটা যখন তোমাকেই নিয়ে তখন কথাটা তোমার সঙ্গে প্রথমে কইলে মন্দ হয় না।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "কি কথা বলুন?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া রসরাজ বলিল, "বলছি। কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার, ঐ কবির আহমদটার সঙ্গে কাল তোমার কি কথাবার্তা হয়েছিল।"

"কবির আহমদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল কে আপনাকে বললে?"

রসরাজের মুখে কৌতুকের একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "কে আবার বলবে? আমি নিজেই ত তা জানি। সন্ধ্যার পর কবির আহমদ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গুটি-গুটি নদীর পথ ধ'রে গাঁয়ের দিকে আসছিল। ওরই কোনো গুপ্তচর মনে ক'রে ওকে আমি সাপটে চেপে ধরেছিলাম। তারপর যখন দেখলাম খোদ কর্তা, আর তোমার সঙ্গে দেখা করবার কথা বল্‌লে, তখন দয়া ক'রে ঐ মতি গায়েনের বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে এনে তোমাদের কদম গাছটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। কি কথা হ'ল ওর সঙ্গে?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "সে ব্যক্তিগত কথা শুনে আপনার কাজ নেই তরফদার মশায়।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রসরাজ বলিল, "কাজ আছে কি নেই, সে বিচার আমি করব। কিন্তু ব্যক্তিগত কথা ব'লে কি বলতে চাও? প্রাইভেট কথা?"

"হ্যাঁ, প্রাইভেট কথা।"

"কিন্তু কাল তোমার বাবা বাড়ি ছিলেন না, ওর সঙ্গে প্রাইভেট কথা হওয়া ত' ভাল কথা নয়। ও একটা অতি দুশ্চরিত্র লোক। অত বড় জমিদার-ঘরের বড় ছেলে হ'য়েও আজ পর্যন্ত লম্পটটার বিয়ে হ'ল না। ওর সঙ্গে তোমার কি প্রাইভেট কথা থাকতে পারে বল ত?"

রসরাজের এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া রুষ্টমুখে প্রতিষ্ঠা চুপ করিয়া রহিল।

উত্তরের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রসরাজ বলিল, "আচ্ছা, না বললে ত' না-ই বললে। কিন্তু যে কথা বলতে আমি এসেছি, সে কথা তোমাকে জানাই। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্মে তুমি বরং কলকাতায় তোমার মামার বাড়ি গিয়ে বাস কর।"

"কেন ?"

"এখানে তোমার ভারি বিপদ। আর, তোমার বিপদে জড়িয়ে সমস্ত ঝিঙ্গুরখোলা গ্রামটাই বিপন্ন হ'য়ে পড়বে। চালতা-কাটির রতন চৌধুরী আর ইসমাইলপুরের কবির আহমদ—এই দুই রাম-রাবণের যুদ্ধে আমাদের গ্রামটা সোনার লঙ্কার মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

এবার আর প্রতিষ্ঠার রাগ হইল না; বরং একটু কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আপনার উপমাটা সব দিক দিয়ে খাপ খাচ্ছে না তরফদার মশায়। রতন চৌধুরীকে না-হয় রাম বলেই ধরলাম; কিন্তু কবির আহমদকে কি ক'রে রাবণ ব'লে ধরা যায় বলুন? তিনি অবিবাহিত লম্পট, তাঁর ত এখনো মন্দোদরী হয় নি।"

মনে মনে প্রতিকূল উপমাটার একটা সামঞ্জস্য রচনা করিয়া লইয়া রসরাজ বলিল, "রাগ কোরোনা মা, তোমার ভালর জন্মেই বলছি, এ গ্রামের অন্ততঃ পঞ্চাশ জন লোক আজ ভাবছে, তোমার যেমন মুসলমান দরদ, শীঘ্রই যদি তোমাকে কবির আহমদের মন্দোদরী হ'তে হয় ত' আশ্চর্যের কিছু হবে না। এ বিপদ থেকে তোমার রক্ষে পাওয়ার সেরা উপায় হচ্ছে রতন চৌধুরীর প্রস্তাবে রাজি হ'য়ে তাকে বিয়ে করা।"

সহজ কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "রতন চৌধুরীর সীতা অথবা কবির আহমদের মন্দোদরী হওয়া—এ দুয়ের মধ্যে আমি কোনোটাই পছন্দ করিনে; কিন্তু একান্তই যদি এর মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়, তা হ'লে আমি কবির আহমদের মন্দোদরী হওয়াই বেছে নোব।"

প্রথমে কদর্য উল্লাসের একটা নোংরা হাসি রসরাজের নিঃশব্দ মুখে ফুটিয়া উঠিল; তাহার পর শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে সে বলিল, "তা হ'লে ত পঞ্চাশ জনের কথা যে বলছিলাম, তারা ভুল ভাবছে না!"

"তাদের পঞ্চাশ জনই ভুল ভাবছে। আপনি নিজেও কিন্তু একটা কথা আর ভুল ভাববেন না।"

"কি কথা?"

"ঐ লম্পট দুর্বৃত্ত রতন চৌধুরীর পক্ষে আমার স্বামী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে, তা ভাববেন না।"

"ও!"—এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া রসরাজ বলিল, "কিন্তু শুধু মন্ত্রপড়া স্বামী হওয়ার কথাই ত ভাবছিনে প্রতিষ্ঠা, অন্য কথাও যে ভাবছি। ভীষণ লোক ঐ রতন চৌধুরী; দুর্দান্ত ওর প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি। কলকাতায় ওকে অপমানিত ক'রে কি শত্রুতা ওর সঙ্গে বাধিয়ে এসেছ তা তুমিই জান। সাপ হ'য়ে তোমাকে ছোবলাবার জন্যে ও ফণা তুলে আছে। বিয়ে যদি করতে তা হ'লে ফণা গুটিয়ে তোমাকে হাজার দশেক টাকার সোনায় মুড়ে নিয়ে যেত। আর, সে উপায়ে যদি ওকে ঠাণ্ডা না কর, তা হ'লে একদিন গভীর রাত্রে তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে। আইন-আদালতের কথা ভেবে বৃথা সাহস পেয়ো না। যার টাকা, তারই আইন, তারই আদালত। মকর্দমা যদি হয়, তখন দেখবে তোমাদের বন্ধু-বান্ধবেরাই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর কাটরায় উঠেছে। তখন অবস্থাটা এতই তোমাদের হাতের বাইরে চ'লে গেছে ব'লে মনে হবে যে, তোমার বাবাকে হয়ত নাপিত-পুরুত সঙ্গে নিয়ে চালতাকাঠিতেই ছুটতে হবে। তার চেয়ে কাজটা যদি সসম্মানে নিজের ঘরে ব'সে সারা যায়, তাই ভাল নয় কি?"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা তরফদার মশায়, জোড়হস্ত আর গলবস্ত্র ছাড়া মানুষকে কি আর এক ইঞ্চিও ওপরে ভাবতে পারা যায় না?....নাপিত-পুরুত নিয়ে

বাবা চালতাকাটিতে ছুটতেও পারেন মনে ক'রে আপনি বাবাকে হীন করছেন না, করছেন নিজেকে।"

আরক্তনেত্রে রসরাজ বলিল, "কাকে হীন করছি, তা বুঝতে বোধহয় তোমার খুব বেশি দেরি হবে না। একে তুমি মেয়েমানুষ তায় ছেলেমানুষ, তোমাকে আর বেশি কি বলব,—বাঁড়ুজ্জে মশায়কে না-কি নিতান্ত শ্রদ্ধা করি। তাই কর্তব্যবোধে তাঁকে সৎ-পরামর্শ দিতে এসেছিলাম কাল সকালেও একবার আসতে পারি।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আসবেন; কিন্তু বাবাকে পরামর্শ দিয়ে আপনি এ বিষয়ে সুবিধে করতে পারবেন না।"

দৃপ্তস্বরে রসরাজ বলিল, "সুবিধে যদি না করতে পারি তা হ'লে একটা মহা অসুবিধের জন্যে তোমরা তৈরি থেকো। কাল তুমি রজনী দাসকে এমন ক্ষেপিয়ে দিয়েছ যে, সদলে রতন চৌধুরীর দলে যোগ দেবার জন্যে সে দল গড়াতে আরম্ভ করেছে। বাইরে থেকে রতন চৌধুরীর দল, আর ভেতর থেকে রজনী দাসের দল যদি তোমাদের আক্রমণ করে তা হ'লে ঐ শয়তান কবির আহমদ তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না।"

প্রতিষ্ঠার মুখে কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়া উঠিল; শান্তস্বরে সে বলিল, "ঐ আপনার শয়তান কবির আহমদ পিছন দিকে আসছেন।"

চকিতনেত্রে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া রসরাজের দর্পস্ফীত মুখ ত্রাসে চুপসিয়া গেল; বিহ্বল কণ্ঠে সে বলিল, "ঐ লোকটাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। আমাকে অন্য কোনো দিক দিয়ে বার করে, দিতে পার মা?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "যে রকম তাড়াতাড়ি আসছেন। তার কি সময় পাওয়া যাবে? হয়ত' আপনাকে দেখতেও পেয়েছেন।"

আর্তচাপা কণ্ঠে রসরাজ বলিল, "দোহাই মা, আমি যে-সব কথা বলেছি—"

"সে বিষয়ে নির্ভয়ে থাকুন। কিন্তু রজনী দাসকে খবর দিয়ে কবির সাহেবের অনিষ্ট করবার দুর্মতি যেন করবেন না; তা হ'লে নিজে ভারি বিপদে পড়বেন।"

"রামচন্দ্র! তাই কখনো—"

রসরাজ কথা শেষ করিবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠা উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর সুমিষ্ট হাস্যের সহিত যুক্তকরে আহ্বান করিল, "আসুন দাদা, আসুন।"

এই রমণীয় অভ্যর্থনার উত্তর দিবার কোনও সুযোগ কবির আহমদকে না দিয়া রসরাজ প্রতিষ্ঠাকে পিছনে রাখিয়া কবির আহমদের সম্মুখে গিয়া পড়িল; তাহার পর দুই হাত ভূমির দিকে নত করিয়া ধীরে ধীরে পিছু হটিতে হটিতে বলিতে লাগিল, "আসুন হুজুর, আসুন। বসতে আজ্ঞে হোক্।"

তীক্ষ্ণনেত্রে রসরাজের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কবির বলিল, "বস্‌ছি। কিন্তু তরফদার মশায়, আপনি যে এখানে?"

"এ ত' আমার একরকম আত্মীয় বাড়িই হুজুর! আমি ত' এখানে প্রায়ই আসি।"

"তা ত' আসেন। কিন্তু আপনি কোন্ তরফে তরফদারি করছেন, তা ত' ঠিক বুঝতে পারছিনে?—আপনি রজনী দাসের তরফে, না এ তরফে?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রসরাজ বলিল, "সে কি হুজুর! আমি রজনী দাসের তরফে হ'তে যাব কেন? আপনি মনিব যে তরফে; আমিও সেই তরফে, আমি এই তরফে।"

"তবে যে নৌকো-ঘাটে শুনে এলাম আপনি রজনী দাসের তরফে তরফদারি করছেন?"

একথা শুনিয়া রসরাজের মুখ শুকাইল; স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "একেবারে মিথ্যে কথা শুনেছেন হুজুর! বিপিন পাকড়াশীদের কেউ ব'লে থাকবে; তাদের সঙ্গে আমাদের তিন পুরুষের আকচ।

মানব-সমিতির সভ্য হয়ে আমি কখনো রজনী দাসের তরফে তরফদারি করতে পারি।” তাহার পর হঠাৎ গত রাত্রের কথা মনে পড়িয়া গিয়া পাছে কবির গুপ্তচরগিরির কথা তোলে সেই আশঙ্কায় আর কোনো কথা না বলিয়া নত হইয়া সেলাম করিয়া বলিল, “সেলাম হুজুর! আসি তা হ'লে। আপনারা আলাপ করুন।”

কবির বলিল, “আসুন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন তরফদার মশায়, রজনী দাসের তরফে তরফদারি করতে হয় করুন, কিন্তু দো-তরফা তরফদারি করবেন না।”

এ কথা গত রাত্রের গুপ্তচরবৃত্তিরই কাছ ঘেঁষিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া অস্ফুট স্বরে কি-একটা না-বুঝিতে-দেওয়া কথা বলিয়া, আর একবার নত হইয়া সেলাম করিয়া রসরাজ পালাইয়া বাঁচিল।

কবির আহমদ ও প্রতিষ্ঠা দুইটা চেয়ারে সামনা-সামনি উপবেশন করিল।

রসরাজ কিছু দূরে গেলে কবির বলিল, “এই রসরাজের কাছে একটু সাবধান হবেন প্রতিষ্ঠা দেবী।”

প্রতিষ্ঠা বলিল, “তা না-হয় হব। কিন্তু এ কি অন্যায় কথা দাদা!”

হাসিমুখে কবির বলিল, “কি অন্যায়?”

“কাল রাত্রে ছোট বোনের আত্মীয়তায় আমাকে অধিষ্ঠিত ক'রে আজ আবার বলছেন, 'সাবধান হবেন প্রতিষ্ঠা দেবী'? প্রতিষ্ঠা ত' কাল তার দেবিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে হাল্কা হ'য়ে বেঁচেছে।”

মৃদু হাসিয়া কবির বলিল, “কাল নদীর পথে যেতে যেতে রাত্রির অন্ধকারের জাদুতে আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা হয়ত' একটু তাড়া-তাড়ি হয়ে গিয়েছিল। আরও দু-চার দিন দেখে-শুনে শক্ত জমি বুঝে করলে ভাল হ'ত।”

প্রতিষ্ঠা বলিল, "বুঝতে ভুল হয়নি, শক্ত জমিতেই করেছেন। তবুও যদি আরও দু-চার দিন দেখতে-শুনতে চান, আমিও কি তা হ'লে সেই দু-চার দিন আপনাকে আবার কবির সাহেব ব'লে ডাক্‌ব ?"

ব্যগ্র কণ্ঠে কবির বলিল, "না, না। তুমি আর ও ডাকে ডেকোনা প্রতিষ্ঠা।"

কবিরের কথায় এবং কথার দ্যোতনায় প্রতিষ্ঠাও কবির উভয়েই সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কবির বলিল, "বাঁড়ুজ্জে মশায় আজও যে আসেননি, তা লক্ষণেই বুঝতে পারছি।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "ব'লে পাঠিয়েছেন, কাজে আটকে পড়েছেন। কাল হয়ত' আসবেন।"

অদূরে একজন লোক একটা বড় ঝোড়া লইয়া বসিয়াছিল। ঝোড়ার মুখটা চট দিয়া বন্ধ।

হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়ায় সকৌতূহলে চেয়ার হইতে উঠিয়া দুই-চার পা আগাইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল। "কে তুমি ওখানে ব'সে ?"

উত্তর দিল কবির আহমদ ; বলিল, "ও আমার সঙ্গে এসেছে।"

কবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকৌতূহলে প্রতিষ্ঠা বলিল, "আপনার সঙ্গে এসেছে ? ও ঝোড়াটা কিসের ?"

কবির বলিল, "এখানকার জন্যে ওতে কিছু শাক-সব্জি আছে।"

অনুযোগের সুরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "দেখুন দেখি কি অন্যায় ! সামান্য কয়েকটা সন্দেশ কাল পাঠিয়েছিলাম, তার পাল্টায় অত বড় এক ঝোড়া সব্জি !"

হাসিমুখে কবির বলিল, "পাল্টা নয় প্রতিষ্ঠা। তোমার আত্মীয়তার অমন সুমিষ্ট প্রথম উপহারের তুলনা নেই। ঈদ আমার অন্তরের কত শ্রদ্ধা আর আদরের জিনিস তা হয়ত তুমি ঠিক

জান না। সেই ঈদ দিয়ে কাল থেকে তোমার সঙ্গে জীবনের একটা নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হয়েছে। আশ্চর্যভাবে-অপ্রত্যাশিত তোমার ঈদের সওগাত সেই আরম্ভকে অপূর্ব ক'রে দিয়েছে। এক ঝোড়া সব্জি দিয়ে সেই সওগাতের পাল্টা দিতে গেলে বিবেকের কাছে অনাচার হয় প্রতিষ্ঠা।" একটু কি ভাবিয়া, হয়ত চিত্তক্ষেপ একটু অসংযত হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া, বলিল, "তা ছাড়া, এর জন্যে আমি ঠিক দায়ী নই। মালীকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান আজ বেছে বেছে আনাজগুলি ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করেছে। সুতরাং এ ঝোড়া আসলে সুলতানের। তবে আমিও যে একটা ঝোড়া আনিনি, তা নয়। কিন্তু সে ঝোড়া আর তার ভেতরের সবুজ সামগ্রী চামড়ার চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সে ম্যাজিক-ঝোড়ার ওজন নেই, কিন্তু ভার আছে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর এই ম্যাজিক উক্তির যথোচিত উত্তর দিবার বিহ্বলতা হইতে প্রতিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে পকেটে হাত ঢুকাইয়া বলিল, "রোসো, রোসো, তোমার জন্যে আর একটা জিনিস এনেছি, যার ওজনও আছে ভারও আছে।" বলিয়া একটা চিঠি বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠার হাতে দিয়া বলিল, "তোমাকে একটা চিঠিও দিয়েছে সুলতান।"

সযত্নে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া দেখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "বাঃ! এ যে কবিতা! আর, চারদিকে লতা-পাতা-ফুল এঁকে কি সুন্দর সাজানো!"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া কবির মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। চিঠিখানা এইরূপ,—

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রতিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু,

দিদি, লভিয়াছি মোরা তোমার মিষ্ট
উপহার মনোহরা,

আত্মীয়তার সুরভিস্নিগ্ধ
স্নেহ মমতায় ভরা।
শিশির-সিক্ত শাক ও সব্জি
পাঠাইনু উত্তরে,
সে শিশির সাথে মিশায়ে ভক্তি
কৃতজ্ঞ অন্তরে।

স্নেহধন্য
সুলতান

চিঠি পড়িয়া অতিশয় খুসি হইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "কি চমৎকার চিঠি। যেমন কবিতা সুন্দর, তেমনি চমৎকার আঁকাজোকা। এটি আমার মূল্যবান সম্পদ হ'য়ে রইল। কিন্তু সুলতানকে আজ আপনার সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন দাদা?"

কবির বলিল, "নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, এল না। যা বললে মোটামুটি তার মানে হচ্ছে এখন কিছুদিন ধ্যানের পালা চলুক, তারপর দর্শন। পাগল আর কাকে বলে!" বলিয়া হাসিতে লাগিত।

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা হ'লে আমাকেই একদিন সুলতানের দর্শনে যেতে হবে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে কবির বলিল, "সে ত' অতি উত্তম কথা! তা হ'লে শুধু সুলতানই নয়, তার দাদাও দর্শন লাভ ক'রে কৃতার্থ হবে।"

হেমন্তের গাঢ় হিমে সন্ধ্যা শীতল হইয়া আসিতেছিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "এখানে আর ব'সে কাজ নেই দাদা, ঠাণ্ডা প'ড়ে আসছে; আপনি ঘরে গিয়ে বসুন। আমি সুলতানের ভক্তি-শিশির-ভেজা শাক-সব্‌জি মার জিম্মা লাগিয়ে তাঁকে খুসি ক'রে আসি।"

পূর্ব পরিচিত বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কবির বুঝিল আজ সে ঘরের একটু বিশেষ পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে। চারিদিক

ঝাড়ামোছা সাজানো-গোছানো ; দেওয়ালে কেরোসিন ল্যাম্পের চিমনি ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, এবং যত্নে-কাটা বাতি হইতে একটি সুপুষ্ট ধূমহীন উজ্জ্বল শিখা উত্থিত হইতেছে ; ঘরের মধ্যস্থলে চতুর্দিকে চারিটি চেয়ার দিয়া ঘেরা কাঠের একটি ছোট টেবিল, তাহার উপরে সুরম্য টেবিল-ক্লথ পাতা,—সম্ভবতঃ আতিথেয়তার একটি বিশেষ অঙ্গ বহন করিবার অপেক্ষায় আছে।

এই সুযত্নসম্পাদিত আয়োজন কাহার অভ্যর্থনার জন্য অভিপ্রেত, যে কথা বুঝিতে কবিরের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না ; এবং আপাতসাধারণ এই আয়োজন এক মহিমময়ী সুন্দরী তরুণীর অভিপ্রায়ের স্পর্শেই অসাধারণ লাগিতেছে, সে কথা ভাবিয়া তাহার মন রসাপ্লুত হইয়া উঠিল।

দেওয়ালে বিলম্বিত ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের আলেখ্যগুলি কবির ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে দুইখানি ট্রেতে চা ও জলযোগের উপকরণ লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল প্রতিষ্ঠা ও অরবিন্দ।

খাবারের পরিমাণ দেখিয়া বিস্ময়বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে কবির বলিল, "একি কাণ্ড প্রতিষ্ঠা! তোমাদের বাড়িতে একটা দৈত্য-দানব এসেছে না-কি যে এত আয়োজন করেছ ? তা ছাড়া, এলেই খাওয়াতে হবে, সে কথারই বা কি মানে আছে ?"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "এসেছেন ত মাত্র দু'দিন, তা'তে 'এলেই' বলা চলে না! তা ছাড়া, খাওয়া ত' প্রতিদিনের ব্যাপার, একদিন খেয়েছি ব'লে পরের দিন খাব না, এ কথারও কোনো মানে নেই।......দাদা!"

"বল ?"

"দোরের পাশে মা দাঁড়িয়ে আছেন।"

দ্বার-পার্শ্বে শৈলনন্দিনীর শাড়ির আঁচলের সঞ্চলন দেখা যাইতেছিল।

ব্যগ্রভাবে তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া কবির বলিল, "আচ্ছা মা, আপনার ছেলে কি একটা রাক্ষস যে, অত খাবার দিয়েছেন ?"

মৃদুস্বরে শৈলনন্দিনী বলিল, "না বাবা, বেশি ত কিছুই দিইনি, ওটুকু না খেলে দুঃখিত হব।"

কবির বলিল, "দুঃখিত আমি করব না আপনাকে ; মায়ের দেওয়া প্রসাদ সবটুকুই খাব। কিন্তু এবার যদি কোনো দিন আসি, সেদিন কিন্তু দুঃখিত করার দুঃখ দেবেন না আমাকে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

"চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেতে বসুন বাবা।"

শৈলনন্দিনীর শাড়ির অঞ্চল সরিয়া গেল।

চা ও খাবার খাওয়া শেষ হইলে কবির কথাটা পাড়িল। বলিল, "আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। ঈদের পরদিনও সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়িতে একটা মজলিশ বসে। কালকের মজলিশে ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'তে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আজও দেরি হ'লে একটু লজ্জিত হ'তে হবে। তাই, আর বিলম্ব না ক'রে, যে কথাটা বাঁড়ুজ্জে মশায়কে বলতে এসেছিলাম, তোমাকেই বলি।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "বলুন।"

কবির বলিতে লাগিল,—"এই ঝিঙ্গুরখোলা গ্রামে সম্প্রতি তোমরা, বিশেষত তুমি, খুব নিরাপদ নও প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে আমি অনেক খবরই রাখি। চালতাকাটির রতন চৌধুরী পরাক্রান্ত লোক। কিন্তু সে যদি শুধু পরাক্রান্তই হোত তা হ'লেও পার ছিল ; সে মহাপাষণ্ডও। পরাক্রমের সঙ্গে নীচতার যোগ থাকলে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। সে শুধু তোমার রূপেই আকৃষ্ট নয়। তোমার ওপর প্রতিশোধের প্রবৃত্তিও তার অতিশয় উগ্র। কলকাতায় হরিশ মুখার্জি রোডে নরেন চাটুজ্জের বাড়িতে

তুমি তার যা অপমান করেছিলে, তার চোট তোলবার জন্যে সে ক্ষেপে আছে।”

ঠিক এই কথা কিছুপূর্বে রসরাজও বলিতেছিল। কিন্তু কবিরকে সেকথা না বলিয়া সবিস্ময়ে প্রতিষ্ঠা বলিল, “হরিশ মুখার্জি রোডের খবরও আপনি রাখেন দাদা?”

কবির বলিল, “রাখি। তা ছাড়া, আরও অনেক খবরও রাখি। হিংস্র পরাক্রান্ত বাহিনীকে হার মানানোর শীকারীর যেমন একটা উত্তেজনা থাকে, রতন চৌধুরীর তেমনি উত্তেজনা আছে তোমার মতো অপরূপ অথচ দুর্ধর্ষ একটি মেয়েকে হার-মানানো খেলার; বিশেষতঃ সে খেলার মূল যখন আছে অপমানের গ্লানি তোলবার একটা নির্মম হিংসা। তোমাকে সব রকম বিপদ হ'তে রক্ষা করবার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করেছি; কিন্তু প্রতিষ্ঠা, তোমার বিপদের কালে আমি যদি উপস্থিত থাকতে না পারি, তা হ'লে কি ক'রে তোমাকে রক্ষা করতে পারি বল?”

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, “এ বিষয়ে আপনার কি প্রস্তাব বলুন?”

“আমার প্রস্তাব, কিছুদিনের জন্যে, অন্ততঃ বছরখানেকের জন্যে, তোমরা ইসমাইলপুরে গিয়ে বাস করবে চল। হিন্দুপাড়ার মধ্যে আমাদের একটা বাড়ি খালি প'ড়ে আছে, সেইটে সারিয়ে-স্থরিয়ে তোমাদের বাসের উপযোগী ক'রে দেওয়া যাবে। ইস্‌মাইলপুর থেকে ঝিঙ্গুরখোলা দূরের পথ নয়, প্রয়োজন মত বাঁড়ুজ্জেমশায় যাতায়াত করতে পারবেন। তাছাড়া, তোমারও কিছু অসুবিধে হবে না প্রতিষ্ঠা। তোমার যা আদর্শ, তার এলাকা ত' সারা বিশ্ব। আপাতত মুসলমান-প্রধান জায়গা ইসমাইলপুর তোমার হবে সাধনপীঠ। এটুকু আশ্বাস তোমাকে দিয়ে রাখছি আমার মধ্যে যে ওলট-পালট তুমি ঘটিয়েছ, তাতে আমার দ্বারা

তোমার মানব-সমিতির ইষ্ট না হোক, অনিষ্ট কিছু হবে না।”
বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

যে অসংযত চিত্তক্ষেপ এবং তদুদ্ভূত নাটুকেপনাকে কবির সমস্ত অন্তর দিয়া ঘৃণা করে, তাহার কথাবার্তার মধ্যে যদি কিছু তার ছোপ ধরিয়া থাকে, সেই সংশয়ের বশবর্তী হইয়া তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়া দিবার জন্য তাহার এই হাসি।

এক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, “এত বড় সদয় আর হিতকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলবার নেই। বিশেষতঃ এর ভিতর দিয়ে মানব-সমিতির পক্ষে যে অচিন্তনীয় সৌভাগ্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে সহজ নয়।—”

“কিন্তু ?”

হাসিয়া ফেলিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, “কিন্তু আমরা এখান থেকে সংসার তুলে চলে গেলে লোকে মনে করবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আর, তাতে রতন চৌধুরী আর রজনী দাসরা বিশ্রী-রকম প্রশ্রয় পাবে। গুণ্ডারা আসলে তত ভয়ঙ্কর নয়, ভয় ক'রে ক'রে যত ভয়ঙ্কর আমরা তাদের ক'রে রাখি।”

এই প্রসঙ্গে আরও ক্ষণকাল আলোচনা হইল। কিন্তু সংসার তুলিয়া দিয়া পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিবার মতো বৃহৎ প্রশ্নের মীমাংসা একদিনে হয় না। কথা হইল, হরিহর বাঁড়ুজ্জে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া কবির আহমদকে জানানো হইবে।

দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে। পশ্চিম আকাশে তৃতীয়ার ‘ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা’ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদায় গ্রহণের জন্য কবির উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিষ্ঠা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?”

কবির বলিল, "কর।"

"কাল এখানে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, এরই মধ্যে আপনি কি ক'রে সে-সব জানতে পারলেন ?"

একটু হাসিয়া কবির বলিল, "এখানে আমার তিন-চারজন অতি দক্ষ আর বিশ্বাসী গুপ্তচর আছে। তাদের মধ্যে একজন ঘটনাক্রমে আজ নৌকো-ঘাটে উপস্থিত ছিল। তার কাছে সব জানতে পারলাম, মায় ফেরার পথে রজনী দাসের সঙ্গে তোমার সদালাপ পর্যন্ত।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

"এক মিনিট দাঁড়ান দাদা, এখনি আসছি।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা অন্দরে প্রবেশ করিল ; এবং অনতিবিলম্বে একটা গাত্রবস্ত্র গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চলুন, কালকের মতো আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

কবির বলিল, "আজ এক পা-ও নয়। আজ গ্রামের পথটুকুও একা যেতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

নির্বন্ধ সহকারে প্রতিষ্ঠা বলিল, "রসরাজবাবু আপনাকে দেখে গেছেন ; আজকে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুতেই আমি আপনাকে একা ছেড়ে দোব না।"

হাসিমুখে কবির বলিল, "রজনী দাসের কথা ভেবে বলছ ত ? কিন্তু প্রতিষ্ঠা, রজনী দাস আসলে তত ভয়ঙ্কর নয়, ভয় ক'রে ক'রে যত ভয়ঙ্কর আমরা তাকে মনে ক'রে থাকি।"

প্রতিষ্ঠার বাক্যের কড়িতে কবিরের এই উত্তর দেওয়ায় প্রতিষ্ঠা ও কবির একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে না যদি যাই, তাহ'লেও কিন্তু একটা অনিষ্ট হবে দাদা।"

"কি, বল ত ?"

"আমি ভয় পেয়েছি মনে করিয়ে রজনী দাসকে আরও খানিকটা ভয়ঙ্কর ক'রে দেওয়া হবে।"

সহাস্যমুখে কবির বলিল, "তা-ও বটে। তবুও আজ তোমার যাওয়া হবে না। তা ছাড়া, আজ আমি ত একা নই, সঙ্গে লোক আছে।"

"তা থাক্। আজ আপনাকে আর অর্ধপথ নয়, একেবারে নদী পর্যন্ত পৌঁছে দোব।"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "তা যদি দাও, তা হ'লে অবশ্য রজনী দাসের জন্যে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না।"

"কেন?"

"তা হ'লে তোমাকে লঞ্চে তুলে নিয়ে ইসমাইলপুরের মজলিশে গিয়ে একেবারে মধ্যমণি করে বসিয়ে দিই।"

"তা হ'লে, তাই চলুন।" বলিয়া হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা কবিরের পিছু পিছু অঙ্গনে নামিয়া পড়িল।

দাঁড়াইয়া পড়িয়া কবির বলিল, "একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় প্রতিষ্ঠা, উত্তর দিতে তোমরা যদি বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকে তাহ'লে নিশ্চয়ই দিয়ো না।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "সে আশ্বাস দিলাম। আপত্তির কিছু থাকলে নিশ্চয় উত্তর দোব না। কি কথা বলুন?"

কবির বলিল, "কি জন্যে তোমার ওপর রতন চৌধুরীর অত আক্রোশ, সেই কথা। তোমাদের কলেজের এক অনুষ্ঠানে তোমাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে ও কোনো অভাবপীড়িত বড় ঘরের একটি মেয়ের সাহায্যে কত চেষ্টা-চরিত্র করেছিল, কত মূল্যবান উপহারের চার ফেলেছিল, তা জানি; আর, এ কথাও জানি, তুমি তার সকল চেষ্টা ঘৃণার সঙ্গে শুধু ব্যর্থই করনি, সে নিরস্ত না হ'লে চিঠি লিখে তার দুর্মতির কথা তার স্ত্রীকে জানাবে ব'লে শাসিয়েও ছিলে।"

বিস্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "ও-দিকের অনেক কথাই ত' জানেন দাদা, নরেনবাবুর বাড়ির কোনো কথা জানেন না?"

কবির বলিল, "শুধু জানি, রতন চৌধুরীর দূর সম্পর্কের কাকা নরেন চাটুজ্জের বাড়িতে নরেন চাটুজ্জের মেয়ে অনীতার জন্মদিনের উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল রতন চৌধুরীরই অর্থে আর কৌশলে; আর সে উৎসবে রতন চৌধুরী তোমারও নিমন্ত্রণ ঘটিয়েছিল।"

কবিরের কথা তখনো শেষ হয় নাই, ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কিন্তু অনীতা আমার অজানা নয় দাদা; আমাদের কলেজের অভিনয়ে তারও পার্ট ছিল।"

"সেই সুযোগেই রতন চৌধুরী ফাঁদ পাততে পেরেছিল। কিন্তু সে ফাঁদে শিকার ধরা না পড়ে ফেঁসে গিয়েছিল শিকারী নিজেই। বোধহয় তার কোনো অতি গর্হিত আচরণে অত্যন্ত রাগত হ'য়ে তীব্র ভাষায় তুমি তাকে তিরস্কার করেছিলে, যার জ্বলুনিতে আত্ম-হারা হ'য়ে পরিবেশ ভুলে গিয়ে নোংরা ভাষায় তোমাকে কতকগুলো কটুকাটব্য ক'রে আর ভয় দেখিয়ে সে স'রে পড়েছিল। কিন্তু কি গর্হিত আচরণ সে করেছিল, আর তার উত্তরে কি করেছিলে তুমি তিরস্কার, তা আজ পর্যন্ত জানতে পারি নি।"

তার কারণ, আজ পর্যন্ত সে কথা আমার কাছ থেকে কেউ জানে নি; এমন কি, নরেনবাবুর স্ত্রী পর্যন্ত সেদিন অনেক পেড়া-পীড়ি করেও জানতে পারেন নি।"

কবির বলিল, "তাহলে আমাকেও জানিয়ো না।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "না জানালেই বোধহয় ভাল ছিল। কথাটা এতই নোংরা যে, কেমন করে তা ভদ্র ভাষায় আপনাকে ঠিক বোঝাব, তাই ভাবছি।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তখন অনেকেই চ'লে গিয়েছে। নরেনবাবুর বাড়ির ভিতর দিকের বারান্দার এক প্রান্তে আমি আর আমার এক বান্ধবী ব'সে গল্প করছি, এমন সময়ে সেখানে হঠাৎ রতন চৌধুরী এসে দাঁড়াতে একসঙ্গে আমরা দুজনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "তুমি আর হেমলতা।"

"তা-ও আপনি জানেন দেখছি। হ্যাঁ, আমি আর হেমলতা। রতন চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মিস্ ব্যানার্জি, এক মিনিট আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।' তারপর হেমলতাকে বল্লে, 'আপনি যদি দয়া ক'রে—' কথা শেষ করতে হ'ল না, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা কথা কন' ব'লে হেমলতা স'রে গেল। তখন পাষণ্ডটা বল্লে, 'আমি শুনেছি মিস্ ব্যানার্জি, মানব-সমিতি নামে আপনি এক মহৎ আদর্শের সমিতি গড়বার কল্পনা করছেন। আমি আপনার সমিতির অর্থভাণ্ডারে আজ পাঁচ শ' টাকা দিচ্ছি, এ-টাকা যদি যথেষ্ট মনে হয়, আমাকে তার দ্বারা আপনার সমিতির আজীবন সদস্য ক'রে নেবেন।' ব'লে পকেট থেকে একটা খাম বার ক'রে আমার সামনে তেপায়ার ওপর রেখে বললে, এতে পাঁচ শ' টাকা আছে। এ ছাড়া কাল সন্ধ্যাবেলা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আরও পাঁচ শ' টাকা দোব, আপনার অনুগ্রহের একটি কণা পাবার জন্যে।' তখনো আমি ধারণাই করতে পারিনি, একটা অতি কুৎসিত প্রস্তাব করবার জন্যে সে উদ্যত হয়েছে। যাতে আর কখনো তার দুরাকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিতে না পারে তার উপযুক্ত আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি অনুগ্রহ আপনি পেতে চান -' বল্লে, 'কিছুতেই ত' আপনাকে চিরদিনের বাঁধনে বাঁধতে পারলাম না, তাই ভিক্ষা করছি মাত্র একটি ঘণ্টার অনুগ্রহ।' একটা বিলিতি হোটেলের নাম করে বললে, 'ও হোটেলে আমার একটা কামরা ভাড়া করা আছে। সেই কামরায় কাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা আপনার একান্ত সঙ্গ প্রার্থনা করছি। তারপর পাঁচ শ' টাকার আর একটি খাম আপনাকে দিয়ে দুজনে ডিনার খাওয়ার পর আপনাকে আপনার মামার বাড়ি পৌঁছে দোব!"

ক্রুদ্ধ কঠিন স্বরে কবির বলিল, "হারামজাদা শয়তানের ধৃষ্টতা কম নয় ত! ওর মুখে থুতু দিলে না কেন প্রতিষ্ঠা?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "এ প্রস্তাব ত ভদ্র প্রস্তাব। এর পর, ভবিষ্যতে কোনো সম্ভাবিত অসুবিধের বিরুদ্ধে হতভাগা আমাকে আশ্বাসের যে ইঙ্গিত দিয়েছিল, তা এত কদর্য যে, সেকথা আমি আপনাকে কিছুতেই বলতে পারব না।"

মাথা নাড়িয়া গভীর স্বরে কবির বলিল, "না, না, তোমাকে বলতে হবে না। তুমি কি উত্তর দিলে, শুধু তাই বল।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল; কষ্টে তা চেপে রেখে শান্ত স্বরে বললাম, 'দেখুন, মাত্র পাঁচ-ছ দিন হ'ল কিনেছি, আপনার ছোঁয়াচ লাগলে আর ত ব্যবহার করা চলবে না, ফেলে দিতে হবে,—নইলে আপনার প্রস্তাবের উত্তর ত' আমার দু-পায়েই রয়েছে।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে কবির বলিল, "এই কথা তুমি বললে ?"

"বললাম।"

"সাবাস! ভাই, সাবাস! আমি তোমাকে আমার সেলাম দিই।" বলিয়া কবির ডান হাত তুলিয়া প্রতিষ্ঠাকে অভিবাদন করিল।

"শয়তানটা তারপর কি করলে ?"

"জীবনে এ অপমানের শতাংশও বোধহয় ওকে কোনোদিন ভোগ করতে হয়নি। মুহূর্তের জন্যে একটু যেন থ মেরে গেল। তারপর দু পায়ের বস্তু জোড়ার অর্থ যখন সুস্পষ্ট হ'ল, তখন তুবড়ির মতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে তর্জনী আস্ফালিত ক'রে বললে, 'এর আঠারো আনা শোধ যদি না তুলি তাহ'লে আমি বাপের সন্তান নই!' ব'লে টাকার খামটা তুলে নিয়ে কটুকাটব্য করতে করতে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এটুকু না জানলেও আপনি ত অনেক কথাই জানেন দাদা! কার কাছে জানলেন ? হেমলতার কাছে ?"

কবির বলিল, "নিতান্ত ঘটনাক্রমে,—লোকনাথ হাজরার কাছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "হেমলতার স্বামী লোকনাথ হাজরা ?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?"

"লোকনাথ আমার কলেজ-বন্ধু। দুঃখের কথা আর কি বলব প্রতিষ্ঠা! রতন চৌধুরীকে তুমি যদি বিয়ে করতে তাহলে তুমিও হ'তে মহামহিমমহিমার্ণবা চৌধুরাণী সাহেবা, আর গরিবের ঘরেও হাজার টাকা ফিরে আসত!"

"তার মানে ?"

"তার মানে, লোকনাথ আমার কাছে এক হাজার টাকা কর্জ নিয়েছে। টাকাটা চাইতে গেলে সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল, ঝিঙুরখোলার প্রতিষ্ঠা বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে রতন চৌধুরীর জবর বিয়ের ঘটকালি করছে তার স্ত্রী হেমলতা। বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারলে তারা পাঁচ হাজার টাকা ঘটকালি পাবে, আর তা থেকে আমার টাকাটা অনায়াসে শোধ ক'রে দেবে।"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "তাহলে ত' আমি আপনার হাজার-খানেক টাকা ক্ষতি করে দিয়েছি!"

কবির বলিল, "টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবে দিয়েছ, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া, তখন আমি শুধু চালতা-কাটির রতন চৌধুরীকেই জানতাম, ঝিঙুরখোলার প্রতিষ্ঠা বাঁড়ুজ্জেকে তখনো চোখে দেখিনি; কাজেই চোখের ওপর তখন হাজার টাকাই শুধু ছিল। তারপর, কিছুদিন পরে যখন মাধবগঞ্জের মাঠে প্রতিষ্ঠা বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে মুলাকাত হোল, তখন একদিকে যেমন হাজার টাকার লালসা গেল উবে, অন্যদিকে তেমনি রতন চৌধুরীর লালসাকেও খানিকটা ক্ষমা না ক'রে পারলাম না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"ফকির!"

অদূরে ফকির অপেক্ষা করিতেছিল; প্রভুর আহ্বান পাইয়া দ্রুতপদে লাঠি হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হুজুর!"

"এবার চল্ নৌকো-ঘাটে। যা, পথে গিয়ে দাঁড়া।"

ফকির প্রস্থানোদ্যত হইলে কবির বলিল, "তোর কাঁধে ও কি ঝুল্‌ছে?"

মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে ফকির বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, মা-ঠাকরোণ খাবার দিয়েছেন।"

"খাস্‌নি কেন?"

"অনেক ছিল। খানিকটা খেয়েছি, খানিকটা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা যা, ঐখানে গিয়ে দাঁড়া।"

ফকির প্রস্থান করিলে কবির বলিল, "বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে ওর সদ্যবিবাহিত অর্ধাঙ্গিনীর জন্যে। বল্‌ছে খানিকটা; কিন্তু আমার বিশ্বাস, অর্ধেকেরও বেশী। ঐ জোয়ান-মর্দ কাঁধের-টুকু খেতে পারত না ব'লে মনে কর?" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সাধে কি বিয়ে করিনি প্রতিষ্ঠা? ও দুস্ক্রিয়ার অনেক দুঃখু! তোমাদের দেওয়া যে উপাদেয় খাদ্য চেটেপুটে খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম, বাড়িতে বিবি থাকলে কাঁধে ঝুলিয়ে একান্ত না হোক, পকেটে পুরে কিছু কিছু নিজের পেট কেটে হয়ত' নিয়ে যেতাম।"

কবিরের পরিহাস-বচনে কবির এবং প্রতিষ্ঠা উভয়েই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা চললাম প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ভারি খুশি হ'য়ে চললাম। পাষণ্ডদলনীরূপে আজ তোমার আর এক দফা পরিচয় পেয়ে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।" বলিয়া কবির প্রস্থানোদ্যত হইল।

"চলুন দাদা, অন্ততঃ গ্রামের সীমানা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

হাত বাড়াইয়া প্রতিষ্ঠাকে নিবারিত করিয়া কবির বলিল, "এক পা-ও নয়।"

কবিরের সংবাদ দিতে রসরাজ কাল একটু বিলম্ব করিয়াছিল বলিয়া রজনী দাসের আক্ষেপের কথা প্রতিষ্ঠার মনে ছিল; বলিল, "আপনি এসেছেন সে কথা তরফদার মশায় অনেক আগে জেনে গেছেন। আমি সাক্ষী থাকলে কেউ আপনার দেহে চোট দিতে সাহস করবে না।"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া কবির অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি যে-কথা বলছ তা স্বীকার করি; কিন্তু আজ আমি ত' একা নই প্রতিষ্ঠা, যে দুর্দান্ত লেঠেল ফকির আমার পিছনে থাকবে, তার পঞ্চাশ হাতের এলাকা নিতে সাহস করে এমন লেঠেল ইসমাইলপুর-ঝিঙ্গুরখোলার তল্লাটে নেই। ড্রিল-মাস্টার রজনী দাসকে সামনে পেলে ফকির ওকে ভাল ক'রে ড্রিল করিয়ে ছাড়বে। তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।"

কবির প্রস্থান করিল।

বার

দিন ছুই পরের কথা।

বেলা তখন তিনটা। বহির্বাটির নিজস্ব বসিবার ঘরে একটা চেয়ারে বসিয়া সুলতান আহমদ ইজেলের উপর রাখা একটা ক্যান্‌ভাসের অঙ্গে রঙ চড়াইতেছিল, এমন সময়ে তাহাদের সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণের প্রান্তে গেট অতিক্রম করিয়া একটা ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল।

শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিয়া আগন্তুককে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সুলতান তুলি হস্তে জানালার ধারে উপস্থিত হইল।

গেট পার হইয়া ডান দিকে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা বৃহৎ অর্জুন গাছ আছে। হেমন্তের অপরাহ্ণে রৌদ্র স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সেই গাছতলায় গাড়ি লইয়া গিয়া গাড়োয়ান গোরু খুলিয়া দিল। গাড়ি হইতে অবতরণ করিল প্রথমে প্রতিষ্ঠা, পরে তাহার পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সুলতানের অপরিচিত। কিন্তু কতকটা মাধবগঞ্জের সভায় একদিন দেখিয়াছিল বলিয়া, এবং কতকটা সম্ভাবনা-অনুমানের বিচারে প্রতিষ্ঠাকে সে সহজেই চিনিল; এবং সেই সূত্রে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও চিনিতে অসুবিধা হইল না।

কবির আহমদ তখন তাহার অফিস ঘরে বসিয়া একজন নায়েব ও একজন কারকুনের সহিত জমিদারি সংক্রান্ত কাগজ-পত্র লইয়া আলোচনা করিতেছিল। নায়েব মুসলমান, কারকুন হিন্দু।

তুলি রাখিয়া দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া সুলতান বলিল, "দাদা, প্রতিষ্ঠাদিদি আর তাঁর বাবা এসেছেন।"

নিজ স্বার্থানুগত তাৎপর্যের আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে কবির একটা একরারনামার মধ্যে নিমগ্ন ছিল; সুলতানের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া আগ্রহ সহকারে বলিল, "এসেছেন? কোথায় বসিয়েছিস তাঁদের?"

"বসাইনি এখনো। অর্জুন গাছের তলায় গাড়ি থেকে দুজনকে নামতে দেখেই তোমার কাছে এসেছি। এতক্ষণে বোধহয় তাঁরা কাছাকাছি এসে পড়লেন।"

সুলতানের কথা শুনিয়াই কবির ফাইল বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফাইলটা নায়েবের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "আজ এই পর্যন্তই থাক,—কাল বেলা নটার সময়ে আবার বসা যাবে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি বারন্দায় বাহির হইয়া আসিল।

তখন হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিষ্ঠা বারান্দার সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইয়া দুইজন পরিচারকের কাছে নিজেদের পরিচয়াদি দিতেছিল। মনিব দুইজনকে অভ্যর্থনাব্যঞ্জন উৎফুল্লমুখে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া পরিচারকেরা সরিয়া পড়িল।

দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়া গিয়া যুক্তকর হইয়া কবির স্মিতমুখে আগ্রহে অতিথিদ্বয়কে আহ্বান করিল,—"আসুন, আসুন বাঁড়ুজ্জে-মশায়! আজ্ঞাজ্ঞে হোক্। আপনার মতো সাধু আর পণ্ডিত-ব্যক্তির পদধূলি লাভ ক'রে আজ আমাদের গরিবখানা পবিত্র হ'ল!" তাহার পর প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিমুখে বলিল, "এস বোন প্রতিষ্ঠা! তোমাকে আর বেশি কথা ব'লে আত্মীয়তাকে ক্ষুন্ন করব না,—তুমি তোমার দাদার বাড়িতে শুভাগমন কর।"

উত্তর দিল প্রতিষ্ঠা; হাসিমুখে বলিল, "আমি আরও কম কথা ব'লে আত্মীয়তাকে অক্ষুন্ন রাখব; শুধু দু-হাত জোড় ক'রে বলব, 'ধন্য হলাম দাদার বাড়িতে এসে।"

কবির বলিল, "ধন্য না হ'য়ে খুশি হয়েছ বললে আমি কিন্তু ধন্য হতাম।"

কবিরের কথায় একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

হাসি থামিলে হরিহর বলিল, "আমার কিন্তু দেরি হ'য়ে যাচ্ছে কবির সাহেব।"

সকৌতূহলে কবির বলিল, "কিসের বলুন ত' ?"

"প্রতিবাদ করবার। প্রতিষ্ঠা আর আপনার কথাবার্তা ভেদ ক'রে আপনার ত্রুটি অযথা সাধুবাদের প্রতিবাদ করবার সুযোগ পাচ্ছিনে। আমি সাধুও নই, পণ্ডিতও নই; কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি। যেহেতু আমার কন্যা আপনার আত্মীয়, আমিও আপনার আত্মীয়ই !"

হাসিমুখে কবির বলিল, "তা'তে আর সন্দেহ নেই, আপনি আমার পরম আত্মীয় চাচা। কিন্তু আমার চাচাসাহেব যদি সাধু আর পণ্ডিতও হন, তার প্রতিবাদ আপনি কেমন ক'রে করবেন, বলুন ?" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ভাই-জান !"

পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া কবির বলিল, "কি রে সুলতান ? কি বলছিস্ ?"

"ওঁরা উঠ্‌তে পারছেন না, তুমি পথ আগলে রয়েছ।"

উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কবির বলিল, "আরে! তা-ও ত' বটে! উগ্র আনন্দে অন্যমনস্ক হওয়ায় ও-কথা খেয়ালই হয় নি। আসুন, আসুন !"

সকলে বারান্দায় উঠিলে সুলতান নত হইয়া হরিহরকে নমস্কার করিল, কিন্তু পায়ের ধূলা লইল প্রতিষ্ঠার।

সুলতানের মাথায় হাত রাখিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "তুমি যে সুলতান, সে আমি আন্দাজে বুঝেছিলাম; দাদার মুখে তোমার

নাম শুনে আর সন্দেহ থাকে নি। গেটের কাছ থেকেই তোমাকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম; কিসের জন্যে বল দেখি?"

কবির বলিল, "বোধহয় ওর জামার চটকদার লাল রঙের জন্যে।"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "হ্যাঁ, কতকটা সে কারণেও। কিন্তু ও লাল রঙ ত' কবি-মানুষের পক্ষে মানানসই-ই হয়েছে।" তারপর সুলতানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলাম তুমি বাঁ দিকের ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ডান দিকের ঘরে ঢুকলে। কেমন, বলেছি কি-না?"

ঘাড় নাড়িয়া সুলতান বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, " 'আজ্ঞে হ্যাঁ-ট্যাঁ' বোলোনা, হাঁপিয়ে উঠ্‌ব; দিদির সঙ্গে সহজ ভাষায় কথা কইবে।" তাহার পর স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ও ঘরে কি করছিলে? কবিতা লিখ্‌ছিলে?"

অপ্রতিভমুখে ঘাড় নাড়িয়া সুলতান বলিল, "না।"

"তা হ'লে হয়ত' ছবি আঁকছিলে?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া হাসি মুখে সুলতান চুপ করিয়া রহিল।

হাসিয়া উঠিয়া কবির বলিল, "এবার ধরা প'ড়ে গেছিস সুলতান।" প্রতিষ্ঠার দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ সকাল থেকে ও একটা ফুলকপি আঁকছে। মন্দ হচ্ছে না।"

"তাই না কি? চল ভাই তোমার ফুলকপি দেখিগে।"

স্থির হইল, ফুলকপি দেখিয়াই হউক, অথবা কবিতা শুনিয়াই হউক, আধ ঘণ্টাটাক পরে প্রতিষ্ঠা ও সুলতানকে কবিরের খাস কামরায় উপস্থিত হইতে হইবে; তথায় ইত্যবসরে হরিহরের সহিত কবির একটি জরুরি আলোচনা সারিয়া লইবে। এ ব্যবস্থায় খুসি হইয়া সুলতান ও প্রতিষ্ঠা সুলতানের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে আধঘণ্টার হিসাব ঠিক রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রায় একই সঙ্গে আপন-আপন ঘড়িতে দৃষ্টিপাত করিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমার ঘড়িতে তিনটে বেজে বাইশ মিনিট।"

সুলতান বলিল, "আমার ঘড়িতে একুশ।"

"তা হ'লে তোমাতে আমাতে মাত্র এক মিনিটের অমিল।"

সুলতান বলিল, "সে ঘড়ির কাঁটায় প্রতিষ্ঠা দিদি। মনের কাঁটায় কিন্তু মিনিটে-মিনিটে মিল।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "অতটা আমি জানিনে সুলতান; তবে এ আমি নিশ্চয় জানি, মনের কাঁটায় তোমাতে-আমাতে যে মিনিটে-মিনিটে মিল নেই, তা আমি নিশ্চয়ই জানিনে।"

ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে প্রতিষ্ঠার কথার তাৎপর্য একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুলতান বলিল, "বাঃ, চমৎকার! অকাট্য! আমি যে কথা বলেছিলাম, তা প্রমাণ-সাপেক্ষ; আপনি যা বললেন, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।"

ইজেলের সম্মুখে দুজনে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুল সম্পূর্ণ আঁকা হইয়া গিয়াছে, তলার দিকের গোটা দুই পাতায় ও বোঁটায় রঙ চড়িতে বাকি। ইজেলের পাশে একটা টুলের উপর মডেল রহিয়াছে, —প্রত্যূষে তোলা একটা বৃহৎ আকারের ফুলকপি।

ফুলকপির ছবি দেখিয়া প্রতিষ্ঠার দুই চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "ভারি চমৎকার এঁকেছ সুলতান! ফুলকপি যে আগে ফুল পরে আনাজ, সে সত্যটি আমরা ছেলেবেলা থেকে ফুলকপির চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে ভুলে আছি; আজ তুমি ফুলকপিকে ফুলের মর্যাদা দিয়ে আমাদের ধারণা ঠিক ক'রে দিলে।"

হর্ষোজ্জ্বল মুখে সুলতান বলিল, "আপনার ভাল লেগেছে দিদি?"

"খুব ভাল লেগেছে। সাদা ফুলের ওপর অতি-হাল্কা নীলাভ রঙের আলো-ছায়া লাগিয়ে স্বরূপ আর রূপ দুই মিশিয়ে তুমি অপরূপের সৃষ্টি করেছ। এত সজীব হয়েছে যে, মনে হচ্ছে এক-একটা পাঁপড়ি হাত দিয়ে ছিঁড়ে নেওয়া চলে।"

সুলতান বলিল, "আজ আর হবে না, কাল ছবিটা শেষ করব; তারপর খুলনা থেকে বাঁধিয়ে এনে আপনাকে পাঠিয়ে দোব।"

মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না ভাই, তা কোরো না। আমাদের সামান্য কুটিরে কোথায় এর উপযুক্ত জায়গা পাব বল? তোমাদের প্রাসাদের মর্যাদা থেকে একে বঞ্চিত কোরো না।"

সুলতান বলিল, "না দিদি, জিনিসের যথার্থ মর্যাদা নিয়ে এমন গোল করবেন না। আমাদের এ শুকনো বাড়িকে প্রাসাদই বলুন, আর যাই বলুন, আপনার স্বপ্নমাখা কুটিরে যদি এর গতি ক'রে দিতে পারি, তা হ'লে এ ছবি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তা'তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।...কিন্তু সে যা হবার যথাসময়ে হবে, অনেক সৌভাগ্যে আধ ঘণ্টার জন্যে আপনাকে পেয়েছি; আপনি ভাল ক'রে এই চেয়ারটায় বসুন। আশ মিটিয়ে গল্প করা যাক্।"

ঘরের কোণে একটা গদিমোড়া প্রশস্ত আরাম চেয়ার ছিল: সেইটা সামনের দিকে খানিকটা টানিয়া আনিয়া সুলতান বলিল, "বসুন।" তারপর নিজের চেয়ারটা ঘুরাইয়া প্রতিষ্ঠার সামনা-সামনি করিয়া লইয়া বসিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "দাদা গেলেন, তুমি তাঁর সঙ্গে সেদিন আমাদের বাড়ি গেলে না কেন সুলতান?" বলিয়াই উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া হাসিমুখে বলিল, "না গিয়ে কিন্তু একরকম ভালই করেছিলে।"

সকৌতূহলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন ত'?"

"তুমি নিজে গেলে অমন সুন্দর চিঠিখানা পাঠাতে না ত'। একটা সম্পদ থেকে তা হ'লে বঞ্চিত হতাম।"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া স্বভাবত লাজুক সুলতানের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল, "ঐ সামান্য জিনিসকে সম্পদ বলছেন দিদি?"

"ওকে যদি সম্পদ বলা না চলে তা হ'লে খামের মধ্যে ও

চিঠিখানা না পাঠিয়ে, তোমাদের ত' অনেক টাকা আছে। পাঁচ-সাতখানা এক শ' টাকার নোট পাঠালে না কেন? তা হ'লে ত' সত্যি সত্যিই সম্পদ বলা চল্‌ত?" বলিয়া হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "না সুলতান, শিশিরসিক্ত সব্‌জির সঙ্গে যে ভক্তিটুকু পাঠিয়েছিলে সেটাই নিশ্চয় সম্পদ। আমি যে ক'টা সন্দেশ পাঠিয়েছিলাম, পয়সার হিসেবে তার দাম উল্লেখ না ক'রে 'আত্মীয়তায় সুরভিস্নিগ্ধ স্নেহ-মমতায় ভরা' কেন লিখেছিলে বল?"

স্মিতমুখে সুলতান বলিল, "হার মানলাম দিদি! আপনার যুক্তিবানের আঘাতে দাদারই হার না মেনে উপায় থাকে না, আমি ত' কোন্ ছার।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "দাদা আবার কবে আমার যুক্তিবাণের আঘাতে হার মানলেন?"

"কেন, আপনার মাধবগঞ্জের সভার শেষে যখন আপনাকে ডাকিয়ে এনে দাদা আপনাকে খুব কড়া সুরে শাসন করতে গিয়েছিলেন?"

"তখন কি তুমি সেখানে ছিলে? কই, যতদূর মনে পড়ছে, তুমি ত' সেখানে ছিলে না?"

"না, আমি তখন সেখানে ছিলাম না, সভা ভেঙে যেতেই আমি বাড়ি চ'লে গিয়েছিলাম। সে জন্যে দাদার কাছে বকুনিও কম খাইনি। বাড়ি ফিরে এসে দাদা বলেছিলেন, 'ওরে সুলতান, তুই শুধু টগর ফুলই দেখে এলি, টগর কি রকম টক্‌টকে গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে তা ত দেখলিনে!' ব'লে আপনাকে ধমকাতে গিয়ে নিজে আপনার কাছে কি দারুণ ধমক খেয়েছিলেন, খুঁটিয়ে তার বিবরণ আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! অমন কড়া রাশভারি মানুষ, আপনার কাছে হার মেনে বাড়ি ফিরেছিলেন রাগ না অনুরাগ কোন্‌টা বেশি নিয়ে, তা সেদিন ঠিক করতে পারিনি; পেরেছিলাম পরদিন, যখন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু দবির

সাহেব দাদাকে বলেছিলেন, 'মাধবগঞ্জের সভায় কাল যা দেখলাম তা'তে যদি প্রতিষ্ঠাকে ফওরন নিভিয়ে দিতে না পার, তা হ'লে ও মুসলমান সমাজে আগুন ধরিয়ে দেবে'।"

একাগ্রচিত্তে প্রতিষ্ঠা সুলতানের কথা শুনিতেছিল; সুলতান চুপ করিলে বলিল, "এ কথার উত্তরে দাদা কি বলেছিলেন?"

"দাদা বলেছিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, হিন্দু-মুসলমানের এই ভারতবর্ষে চিরকালই তাদের খেয়োখেয়ি ক'রে বাস করা উচিত, কোনোদিনই মিলে-মিশে এক হওয়া দরকার নয়? প্রতিষ্ঠার যা আদর্শ, আর কাজ করবার যা পদ্ধতি, তার দ্বারা এই হিন্দুপ্রধান হিন্দুস্থানে মুসলমান সমাজ উপকৃতই হবে; মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা আগুন ধরাবে না।"

"এর উত্তরে দবির সাহেব কিছু বলেছিলেন?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিমুখে সুলতান বলিল, "বলেছিলেন, 'মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা আগুন ধরাবে কি ধরাবে না সেটা ভবিষ্যতের কথা; কিন্তু আপাতত তোমার মনে ধরিয়েছে তা দেখতে পাচ্ছি'।"

এ কথার পরে আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া প্রতিষ্ঠা অন্য দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বোধহয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের জন্যই একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সুলতান বলিল, "ও কথার উত্তরে দাদা কিন্তু ভারি চমৎকার কথা বলেছিলেন।"

কি কথা, তাহা প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল না, কিন্তু সুলতানের মুখের উপর দৃষ্টি ফিরাইল।

সুলতান বলিল, "দাদা বলেছিলেন, 'প্রতিষ্ঠা আমার মনে আগুন ধরিয়েছে সে কথা তুমি জানো; কিন্তু আমি জানি, সে আমার মনে আলো জ্বেলেছে'।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, “চল সুলতান, ফুফুকে দেখে আসি।”

বাধা দিয়া সুলতান বলিল, “বসুন, বসুন,—এখনও বিশ মিনিট সময় আছে; ফুফুর জন্যে পাঁচ মিনিট যথেষ্ট।”

প্রতিষ্ঠা পুনরায় ভাল করিয়া আসন গ্রহণ করিলে সুলতান বলিল, “একটা কথার মীমাংসা হ'লে বোধহয় ভাল হয়।”

উৎসুক হইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, “কি কথা বল ত?”

“আপনাকে আমি চিঠিতে দিদি ব'লে সম্বোধন করেছিলাম, সেই হিসেবে আপনি বোধহয় আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো সম্বোধন করছেন। কিন্তু বয়েসের হিসেবে আমিই বোধহয় আপনার দাদা হই।”

“কখ্‌খনো না; সে হিসেবেও আমি তোমার দিদিই হব। কত তোমার বয়স শুনি?”

সুলতান বলিল, “প্রায় উনিশ।”

হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, “বয়েসেও আমি তোমার চেয়ে নিতান্ত কম নয়, দু বছরের বড়। সুতরাং সব দিক দিয়েই আমি তোমার দিদি।”

হাসিমুখে সুলতান বলিল, “বাঁচা গেল। সব দিক দিয়েই তা হ'লে আমি আপনার ছোট ভাই।”

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, “হ্যাঁ ভাই, সব দিক দিয়েই।”

ঘরের চারদিকের দেওয়ালে চাহিয়া দেখিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, “কই, একখানা ছবিও ত' তোমার এ ঘরে টাঙানো দেখছি নে সুলতান?”

সুলতান বলিল, “না,—তৈরি হ'য়েই এ ঘর থেকে আমার ছবিরা বিদায় নেয়।”

“কোথায় আশ্রয় পায় তারা?”

“কতক এই বাড়িরই ঘরে ঘরে দেওয়ালে দেওয়ালে, কতক বন্ধু-

বান্ধব আত্মীয়ের ঘরে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "দিদি, আপনাকে আমার দিন পাঁচেক একান্ত দরকার।"

সকৌতূহলে প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

"আপনার একটা পোর্ট্রেট আঁকব।"

"পোর্ট্রেট আঁকতে পার তুমি?"

"পোর্ট্রেটই আমি বেশি আঁকি।"

"কিন্তু মিছিমিছি আমার পোর্ট্রেট এঁকে কি হবে ভাই?"

"মিছিমিছি নয় দিদি। একজনের জন্মদিনে প্রতিবছর আমি রবীন্দ্রনাথের বই উপহার দিই। এবার তিনি আমার কাছ থেকে বইয়ের বদলে তোমার পোর্ট্রেট চেয়েছেন। অবশ্য তাড়া নেই তার জন্যে; জন্মদিনের এখনো মাস পাঁচেকের ওপর দেরি।"

"কবে জন্মদিন?"

"পঁচিশে বোশেখ।"

"বাঃ! পঁচিশে বোশেখ? দাদার জন্মদিন তা হ'লে ত' বাঙলা দেশের একটা বিশেষ গৌরবময় জন্মদিনের সঙ্গে এক!"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া বিস্মিতকণ্ঠে সুলতান বলিল, "কি আশ্চর্য। জন্মদিন যে দাদার, তা ত' আপনি ঠিক ধরেছেন!"

মৃদুস্মিত মুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "না ধ'রে উপায় ছিল না সুলতান। যাঁর জন্মদিনে আমার ছবি তুমি উপহার দেবে তিনি কবির অথবা দবির, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় থাকলেই আশ্চর্য হওয়ায় কথা হোত।"

হাসিয়া উঠিয়া সুলতান বলিল, "তা বটে। এটুকু আমার খেয়াল হওয়া উচিত ছিল।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, আপনি কি জাদু জানেন?"

শুনিয়া প্রতিষ্ঠার মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "কেন বল দেখি? তোমাকে জাদু করেছি না-কি?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত সুলতান বলিল, "আমাকে ত'

করেইছেন। না-ই যদি করবেন, না দেখে-শুনে আপনার কুটিরকে স্বপ্নমাখা মনে করি কি ক'রে বলুন ?··আমি ত' চুনোপুঁটি, আমাকে জাদু করায় এমন-কিছু বাহাদুরি নেই; বাহাদুরি করেছেন রাঘব বোয়ালকে জাদু ক'রে।···রাঘব বোয়াল কাকে বলছি, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "পারছি! কিন্তু জাদু কি ক'রে করলাম, তা বুঝতে পারছিনে।"

অল্প একটু হাসিয়া সুলতান বলিল, "যে করে সে বোধহয় বুঝতে পারে না, কিন্তু যে বোঝে সে ধরতে পারে। ভারি দুর্দান্ত লোক আমাদের ইসমাইলপুরের বড় মিঞা। মাত্র সাতাশ বছর বয়স হ'লে কি হয়, জীবনে এ পর্যন্ত কোন দিন কারো কাছে হার স্বীকার অথবা মাথা নিচু করেন নি। বছর তিনেকের কথা,— এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একটু অপমান করাতে এমন আগুন হ'য়ে উঠেছিলেন বড় মিঞা যে, লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে বাঁচে। সেই বড় মিঞাকে আপনি মাধবগঞ্জের সভা ভাঙার পর কি কটূক্তিই না করেছিলেন! যে বাগযুদ্ধ আপনাদের দুজনের মধ্যে হ'য়েছিল, বাড়ি ফিরে আমাকে বলতে কিছুই ত' বাকি রাখেন নি। যাঁর সামনে এসে দারোগারা হাত জোড় ক'রে দাঁড়ায়, তাঁকে যখন আপনি বলেছিলেন, 'আর যাই করুন, দারোগার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করবেন না', তখন তাঁর ইজ্জতে অপমানের কত নির্মম চোট পৌছবার কথা তা ইসমাইলপুরের ছোট মিঞাই জানে। অথচ আশ্চর্য! ঐ অত বড় অপমান যেভাবে দাদা বরদাস্ত করলেন তা একমাত্র জাদুর দ্বারাই সম্ভব ছাড়া আর কি ভাবতে পারি জানিনে।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "বোধহয় আমি মেয়ে ব'লে বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুরুষ হ'লে ঘুঁসি মেরে তার নাক ভেঙে দিতেন।"

কয়েকবার মাথা আন্দোলিত করিয়া সুলতান বলিল, "না, না, না, তা নয়; মেয়ে ব'লেই তাজ্জবের কথা আরও বেশি হয়েছে। দাদার মতো অত বড় মেয়ে-বিদ্বেষী আমি ত' আর একটিও দেখিনি। কত বড় বড় ঘরের কত অপরূপ সুন্দরী মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারা যায়নি সাদিতে। আপনি মেয়ে ব'লে আপনাকে বরদাস্ত করবার কোনো হেতু ছিল না তাঁর। অবশ্য শুধু আপনারই বা কেন, কোনো মেয়েরই তিনি ঘুঁসি মেরে নাক ভাঙতেন না; কিন্তু নাক ভাঙা ছাড়া মেয়েদের আরও নিদারুণ আঘাত দেবার উপায়ের ত' অভাব নেই দিদি?"

অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, তা নেই।"

সুলতান বলিতে লাগিল, "মাঠ থেকে দাদা শুধু আপনার দেওয়া আঘাত বরদাস্ত ক'রেই ফেরেননি, একেবারে ওকালতনামা সই ক'রে আপনার উকিল হ'য়ে ফিরেছিলেন। পরদিন সকালে আপনার হ'য়ে কি ওকালতিই না দবির সাহেবের বিরুদ্ধে করেছিলেন। হেরে গিয়ে দবির সাহেব যে কথা বলেছিলেন, তা অবশ্য শ্লেষ ক'রেই বলেছিলেন; কিন্তু যা বলেছিলেন তা যদি হবার হোত, তা হ'লে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হ'তে পারত না।"

ঈষৎ গভীর স্বরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "যা হবার নয়, তা না হ'লেও ভাল যে হ'তে পারে না, তা-ও নয় সুলতান।"

"তাকেই ত লোকে জাদুর খেলা বলে দিদি।" বলিয়া সুলতান হাসিয়া উঠিল।

প্রতিষ্ঠারও মুখে অতি ক্ষীণ হাস্যদ্যুতি স্ফুরিত হইয়া মিলাইয়া গেল।

সুলতান বলিল, "দাদা মানব-সমিতির সভ্য হয়েছেন প্রতিষ্ঠা দিদি?"

মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, হন নি।"

"হবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ?"

"না।"

"কেন ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "যেদিন উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে হবেন, সেই শুভদিনের জন্যে অপেক্ষা করে আছি।" সুলতান কিছু বলিবার পূর্বে পুনরায় বলিল, "মাধবগঞ্জের মাঠে তোমার দাদার প্রতি শুধু কটূক্তিই করিনি সুলতান, তাঁকে এ এলাকার শ্রেষ্ঠ মরদ বলেছিলাম, আর বলেছিলাম সেই মরদের মদৎ আমাকে পেতেই হবে।"

সবিস্ময়ে সুলতান বলিল, "কি আশ্চর্য! এমন চমৎকার কথাটা ত' দাদা আমার কাছে বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন! এ কথার উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন ?"

"যতদূর মনে পড়ছে, বলেননি কিছু, চুপ ক'রে ছিলেন।"

উল্লসিত কণ্ঠে সুলতান বলিল, "চুপ ক'রে থাকা ত' একরকম রাজি হওয়াই। তা হ'লে মদৎ নিতে আরম্ভ করুন না দিদি! বিলম্বে কি কাজ ?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "বিলম্ব ত করিনি ভাই। যে মুহূর্তে দুরূহ মদৎ নেবার কারণ উপস্থিত হয়েছে, সেই মুহূর্তেই চেয়েছি। আর পেয়েছি। মালিনী দাসের কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। মালিনী দাসের ব্যাপারে আমি কবির সাহেবের মদৎ চেয়েছিলাম মানব-সমিতির সম্পাদিকা রূপে।"

সুলতান বলিল, "তা বটে।"

হাতঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "এবার বোধহয় ফুফুর কাছে যাওয়া যেতে পারে।"

সুলতান বলিল, "চলুন। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মানব-সমিতির সভ্য হবার নিয়ম কি ? আপনাদের চাঁদা আছে ত ?"

"আছে।"

"কত ক'রে?"

"মাসে মাসে দিলে প্রতিমাসে দু-পয়সা। বছরের চাঁদা এক-সঙ্গে দিলে চার আনা।"

সুলতান বলিল, "আজীবন সভ্য হবার চাঁদা এক শ' টাকা আমি এখনি দিয়ে দিচ্ছি। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আপনার সমিতির সভ্য ক'রে নিন্ দিদি।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আজীবন সভ্যর চাঁদার কোনো ব্যবস্থা আমাদের নেই। এক শ' টাকা তোমার কাছ থেকে নিলে আমাদের দু-পয়সার গরীব সভ্যরা চাঁদাতেও তোমার সঙ্গে এক হ'তে পারবে না, কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকবে। নিতে হ'লে তোমার কাছ থেকে বার্ষিক চাঁদা চার আনাই নিতে হয়। কিন্তু আমি বলি সুলতান, এখন তোমার সভ্য হ'য়ে কাজ নেই।"

"কেন বলুন ত?"

"আগে দাদা সভ্য হোন্, তারপর সঙ্গে-সঙ্গেই তুমি হ'য়ো।"

এক মুহূর্ত মনে-মনে চিন্তা করিয়া হাসিমুখে সুলতান বলিল, "বুঝেছি আপনার মতলব। কোনো রকম বাঁধনেই দাদাকে না বেঁধে সব চেয়ে শক্ত যে বাঁধন তাইতে বাঁধতে চান।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলুন, ফুফুর কাছে যাওয়া যাক্।"

এদিকে কবিরের বসিবার ঘরে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিরের মধ্যে কথাবার্তা সলা-পরামর্শ শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

হরিহর বলিল, "আপনার আত্মীয়তার প্রস্তাবে আমরা বাড়িশুদ্ধ সকলে অভিভূত হয়েছি কবির সাহেব। এখানে এসে আপনার আশ্রয়ে বছরখানেক বাস করলে রতন চৌধুরীর বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হতাম সে কথা একান্ত সত্য। কিন্তু সমস্ত সংসার

তুলে আনার অসুবিধের যে আপত্তি, তার চেয়ে প্রতিষ্ঠার অনেক বেশি আপত্তি, পাছে আমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম মনে ক'রে রজনী দাসের স্পর্ধা বেড়ে যায়।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কবির বলিল, "কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়; আর, প্রতিষ্ঠার মতো সৎ আর সাহসী মেয়ের পক্ষে ও-রকম ভয়ে ভীত হ'য়ে নতি স্বীকার করাও ত' সম্ভব নয়। কিন্তু লোকটা যদি শুধু দুর্দান্ত আর শক্তিশালীই হোত তাহ'লেও কথা ছিল; আমি জানি ও মারাত্মকভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাই ভয় হয় হঠাৎ রাগের মাথায় তেমন কোনো অনিষ্ট ক'রে না বসে। তা ছাড়া, ঘরেও ত' আপনাদের ভয়ের কারণ কম নেই; ওর দোসর রজনী দাসও আপনাদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছে।"

হরিহর বলিল, "রতন চৌধুরী দুর্দান্ত আর শক্তিশালী লোক, সে কথা আমিও জানি। প্রতিষ্ঠাকে বিয়ে করবার চেষ্টায় নিষ্ফল হওয়ায় সে আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে, সে কথাও সত্যি; কিন্তু কবির সাহেব, সেটা কি আমাদের ওপর অতটা প্রতিহিংসা-পরায়ণ হবার মতো যথেষ্ট গুরুতর কারণ?"

কবির হাসিতে লাগিল; বলিল, "আপনার মতো ধার্মিক আর সদাশয় লোকের হিসেবে নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সাবধানের বিনাশ নেই, তাই সতর্ক থাকবেন, আর, চিন্তার কোনো কারণ উপস্থিত হ'লে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবেন। লোচন সরকারকে জানেন?"

"জানি বই-কি।"

"লোচনকে খবর দিলে, দিন দুপুরই হোক, আর রাত দুপুরই হোক, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সে খবর আমার কাছে পৌঁছে যাবে। চালতাকাটিতেও আমার খবর দেবার লোক আছে। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে মশায়, বিপদ যখন আসে, তখন সাবধানের সব ঘাঁটি এড়িয়েই আসে।

হরিহর বলিল, "সে কথা অকাট্য।"

দু-চার মিনিট পরে সুলতান ও প্রতিষ্ঠা ঘরে প্রবেশ করিল।

হাসিমুখে কবির বলিল, "কটা কবিতা শুনলে প্রতিষ্ঠা?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আজ একটাও শুনিনি; শুধু ছবি দেখেছি আর গল্প করেছি। ফুলকপির ছবি দেখে কিন্তু মুগ্ধ হয়েছি দাদা! রাঁধবার জন্যে কুটতে গেলে বোঝা যাবে, আসল নয়; তা ভিন্ন বোঝবার উপায় নেই।"

সুলতানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কবির বলিল, "শেষ হ'য়ে গেছে না-কি সুলতান?"

মাথা নড়িয়া সুলতান বলিল, "না, একেবারে শেষ হয়নি: তবে তুমি যা দেখেছিলে তার চেয়ে অনেক এগিয়েছে।"

হরিহরের দিকে চাহিয়া কবির বলিল, "সুলতানের ফুলকপি দেখবেন না-কি বাঁড়ুজ্জে মশায়?"

আগ্রহভরে হরিহর বলিল, "দেখব বইকি কবির সাহেব, নিশ্চয় দেখব।"

সকলে মিলিয়া সুলতানের কক্ষে উপস্থিত হইল।

সূর্যাস্তের তখনো আধঘণ্টার বেশি বিলম্ব ছিল; তথাপি হেমন্তের ত্বরমাণ সায়াহ্নের ছায়াপাতে ঘরের ভিতরের আলোক খানিকটা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। সেই অনুজ্জ্বল আলোকের স্তিমিত প্রভায় ফুলকপির চিত্রটি আরও মোলায়েম দেখাইতেছিল।

সপুলক নেত্রে ক্ষণকাল ছবিটিকে নিরীক্ষণ করিয়া হরিহর বলিল, "এ ছবিটি না দেখে বাড়ি ফিরলে ইসমাইলপুরে আসা অসম্পূর্ণ থাকত।"

আরও ক্ষণকাল ছবিটিকে দেখিয়া এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া সকলে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর বলিল' "এবার তা হ'লে আমরা বিদায় নিই কবির সাহেব। পথ ত নিতান্ত কম নয়। বাড়ি পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লাগবে। পথের অবস্থাও জায়গায় জায়গায় তেমন ভাল নয়।"

কবির বলিল, "তার জন্যে অসুবিধে হবে না বাঁড়ুজ্জে মশায়; ও পথে আপনাদের যেতে হবে না।"

বিস্মিত কণ্ঠে হরিহর বলিল, "ও পথে যেতে হবে না?....তার মানে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিল প্রতিষ্ঠা; হাসিমুখে বলিল, "তার মানে, ফিরব আমরা জলপথে। ওঁরা দুভাই আমাদের দুজনকে ওঁদের মোটার লঞ্চ ক'রে পৌঁছে দেবেন।"

কবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হরিহর বলিল, "এ সদয় প্রস্তাবের জন্যে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হলাম, কিন্তু কবির সাহেব, অনর্থক এ কষ্ট করবেন না।"

শুনিয়া কবির হাসিতে লাগিল; বলিল, "আনন্দকে কষ্ট ব'লে আনন্দের প্রতি বেইন সাফি করবেন না চাচাসাহেব।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "তা ছাড়া বাবা, কষ্টই যদি বা হয়। সে কষ্ট সহ্য না ক'রে ওঁদের আর উপায়ও নেই। আমাদের স্থলপথের পথ ওঁরা নিজেরাই বন্ধ করেছেন। বিনোদকে এক পেট খাইয়ে, গরু দুটোকে প্রচুর জাব দিইয়ে, ফল-শাক-সব্জিতে গাড়িখানা ভরিয়ে আধঘণ্টা আগে রওনা করিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণে আমাদের গাড়ি মাধবগঞ্জের মাঠ ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছে।"

হাসিমুখে কবির বলিল, "অসুবিধে হবে না চাচাজী, আমরা এখান থেকে সাতটায় রওনা হ'য়ে ঝিঙ্গুরখোলার নৌকোঘাটে পৌঁছে দেখব আপনাদের গাড়ি সেখানে হাজির রয়েছে। ও পথটুকুও আপনাদের হেঁটে যেতে হবে না।......অনেকক্ষণ আপনারা এসেছেন, এবার যদি দয়া ক'রে একটু—"

কবিরকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "বাবার

জন্যে সে একটুর ব্যবস্থা ত বিপুলভাবে করেছেন দাদা,—গাড়ি বোঝাই ক'রে ফল-মূল পাঠিয়েছেন।"

"কিন্তু সে পাঠানো ফল-মূল দিয়ে এখানকার চাহিদা মেটে কি ক'রে প্রতিষ্ঠা, তা বল?....বাঁড়ুজ্জে মশায় শুদ্ধ সাত্ত্বিক মানুষ, বলতে ভরসা হয় না; কিন্তু আমাদের একজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ আমলার বাড়িতে—"

কবিরের অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যেই কতকটা বিমূঢ়ভাবে হরিহর বলিল, "এ কথার উত্তরও কি বাঁড়ুজ্জে মশায়ের হ'য়ে প্রতিষ্ঠাই দেবে?"

একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হরিহর বলিল, "সূর্যকিরণ গাছের মাথায় চড়েছে, সূর্যাস্তের আর বেশি দেরি নেই। আহ্নিক করবার দণ্ড দেড়েক আগে থেকে সহজে কিছু খাইনে। নইলে, আপত্তি ছিল না।"

কবিরের দিকে চাহিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি কিন্তু আহ্নিক করিনে দাদা।"

এবার প্রচণ্ড হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল; এবং সে হাস্যধ্বনির মধ্যে বোধহয় হরিহরের কণ্ঠস্বরই বেশি শোনা গেল।

তের

হরিণঘাটা নদীর পূর্ব ভূভাগে ইসমাইলপুরের মাইল সাতেক দক্ষিণে নদীতট হইতে মাইল তিনেক দূরে এক দুর্গম দুষ্পরিবহনীয় স্থানে চালতাকাটি গ্রাম চৌধুরী জমিদারদের বৃহৎ পুরাতন অট্টালিকা ও তাহাদের আত্মীয়-আশ্রিত-আমলাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর লইয়া চালতাকাটি। ইহা ছাড়া দু-চার ঘর নিঃসম্পর্ক অধিবাসী যাহা আছে, চৌধুরীদের কঠোর দাপটের নিকট তাহারা জোড়হস্ত। ধোপা-নাপিত-কামার-কুমোর-চাষী, প্রয়োজনীয় নিম্নশ্রেণী, মাইল-খানেক দূরে ভিন্ন গ্রামে বাস করে। আত্মীয়-আশ্রিতরা মোটের উপর অনুগত হইলেও, বিভীষণও যে তাহাদের মধ্যে এক-আধ-জন নাই তাহাও নহে।

শ' দুই বৎসর পূর্বেও যে, চৌধুরীরা চালতাকাটির কুখ্যাত সন্ত্রাস-রুদ্র চাটুজ্জে গোষ্ঠী ছিল, সামান্য জমি-জমা-জমিদারির অন্তরালে যাহাদের অর্থার্জনের প্রকৃত উপায় ছিল জলে ও স্থলে লুটতরাজ এবং ডাকাতি, জনস্মৃতি হইতে সে কথা এখনো একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। সোনায় রূপায় নগদে এবং ভূসম্পত্তিতে যে বিপুল সম্পদ তাহারা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ দস্যুতা এবং সংহারলীলার দ্বারা। তাহার পর দেশে ইংরাজ-শাসনের কঠোরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সহিত কেমন করিয়া ক্রমশঃ তাহারা দস্যুবৃত্তি কমাইতে কমাইতে জমিদারি বাড়াইয়া ফেলিল, এবং কালক্রমে চাটুজ্জে পদবীর খোলস ছাড়াইয়া চৌধুরী জমিদার হইয়া বসিল, সে ইতিহাস আজ অস্পষ্ট।

স্বভাবকে কিন্তু খোলসের মতো সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। সে কথা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, বংশের পক্ষেও তেমনি।

চাটুজ্জেরা চৌধুরী হইয়াছে বটে, কিন্তু বংশগতির সূত্রে তাহাদের স্বভাবের দস্যু মেজাজটি কৃশ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। যে ছিল দুর্দান্ত, সে হইয়াছে পরাক্রান্ত; তরোয়াল হইয়াছে ছুরি। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবরোধের উদ্দেশ্যে চাটুজ্জেদের আমলে চালতাকাটি যেরূপ দুষ্পরিবহনীয় ছিল, চৌধুরীদের আমলেও তেমনি আছে। যাতায়াতের একমাত্র উপায় গ্রাম হইতে হরিণঘাটা নদী পর্যন্ত অতি সঙ্কীর্ণ অসমতল একটা মাইল তিনেকের কাঁচা পথ ভিন্ন, রাজপথ অথবা সড়ক বলিতে যাহা বুঝায়, চালতাকাটির দশ-বারো মাইল পরিধির মধ্যে তাহার নামগন্ধ নাই। বাহিরে যাতায়াতের সময়ে ঐ তিন মাইল দীর্ঘ নদী-অভিমুখ পথে চাটুজ্জেরা যাইত রনপায়ে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে, চৌধুরীরা যায় পাল্কীতে।

লাঠি-সড়কি-বল্লম-কৃপাণের কৃপায় যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, সম্ভবত তাঁহার সহিত পুস্তকহস্তা দেবী সরস্বতীর মৈত্রী থাকে না। একেবারে নিরক্ষরতা না হইলেও শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় চাটুজ্জেদের বংশে তাহার একান্ত অভাব ছিল। চৌধুরীদের আমলে জমি-জমা জমিদারি তেজারতি বৃদ্ধির সহিত কালি-কলম-খাতা-পত্রের প্রয়োজন এবং চাহিদা যেমন উত্তরোত্তর বাড়িয়া আসিয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ-পথ পাইয়া সাধারণ শিক্ষাও তেমনি ধীরে ধীরে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্বে সাড়ে তের-আনা অংশের মালিক মেধাবী রতনলাল চৌধুরী ইংরাজী সাহিত্যে অনার্সের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চৌধুরী বংশের অবিদ্যা ও অশিক্ষার অপযশ খানিকটা অপনীত করিয়াছে বটে; কিন্তু

স্বভাব যেমন যার, কভু না হয় ভাল,
কয়লা ধুয়ে দেখো, যে-কালো সে-কালো।

শিক্ষার পটুতার দ্বারা শাণিত হইয়া রতন চৌধুরীর রক্তগত দুষ্প্রবৃত্তি

যেন আরও খানিকটা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। নারী-লালসা তাহার অন্তরের সর্বপ্রধান দুষ্প্রবৃত্তি।

চালতাকাটি গ্রামের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে চৌধুরীদের বৃহৎ অট্টালিকা। যুগে যুগে তাহার এক-একটা দিক যেমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, প্রয়োজন অনুসারে অন্য দিক তেমনি নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি। নবনির্মিত অংশের দক্ষিণ দিকের বসিবার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া রতন চৌধুরী দুই-জন প্রজার বিবাদের ফরিয়াদ শুনিতেছিল, এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিল সর্দার আবদুর রহমান ;—দীর্ঘ সাড়ে ছয় ফুট বলিষ্ঠ দেহ; দুই বাহুর পাকানো পেশী লোহার দড়ার মতো কঠিন; আরক্ত নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টির মধ্যে হিংস্র নির্মমতার অবলেপ এমন পাকিয়া গিয়াছে যে, সম্ভ্রম প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইলেও তাহার সবটা স্তিমিত হয় না; মাথার দুই পাশের কেশে অল্প অল্প পাক ধরিয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অনবচিত শক্তিমত্তার রুক্ষ দম্ভ। আবদুর রহমানের পূর্বপুরুষেরা চাটুজ্জেদের লুঠ-তরাজ-ডাকাতি ইত্যাদি কার্যকলাপে ধনুক-বল্লম-কৃপাণ লইয়া হাজির হইত; এখনকার বংশধরেরা প্রজাপীড়নে চৌধুরীদের পক্ষে লাঠি ধরে। শৌর্যে সাহসে হিংস্রতায় সর্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া চৌধুরীরা আবদুর রহমানকে সর্দার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

রতনলালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া আবদুর রহমান বলিল, "সেলাম মালিক।"

রতনলাল বলিল, "সেলাম সর্দার। সব ভাল ত' তোমাদের?"

ঘাড় নাড়িয়া করজোড়ে আবদুর রহমান বলিল, "হুজুরের দোয়ায় সব তনদুরস্ত।"

রতনলালের নিকট হইতে ইশারা পাইয়া প্রজা দুইজন কক্ষ

ত্যাগ করিলে রতনলাল বলিল, "কি জন্যে তোমাকে তলব করেছি, শুনেছ সর্দার?"

"শুনেছি মালিক। যশোদাবাবুকে হুজুর যা বল্‌তে বলেছিলেন, তিনি আমাকে সব বলেছেন।"

"একটা নীচ ঘরের শয়তান মেয়ে যে বে-ইজ্জতি আমার করেছে, তা শুনেছ?"

দুই কানে আঙ্গুল দিয়া আর্তকণ্ঠে আবদুর রহমান বলিল, "তোবা, তোবা! শুনেছি হুজুর! ও কথা আর মুখে আনবেন না। ঝিঙ্গুরখোলার মেয়ে ত'? হুকুম করুন, দু দিনের মধ্যে ও মেয়েকে বেদাগ এনে হুজুরের পায়ের তলায় ফেলে দিই। তারপর মর্জি মতো হুজুর তাকে শায়েস্তা করবেন।"

"এ তুমি পারবে করতে?"

আবদুর রহমানের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "এ সওয়ালেরও কি জবাব দিতে হবে হুজুর? কেন, দু সাল আগে বাজিৎগঞ্জের গৌরী হালদারের বিধবা মেয়েকে হুজুরে যে হাজির করেছিলাম, সে কি এর চেয়ে দশগুণ কঠিন কাজ ছিল না?....এ মেয়েকে কোন্ দিন হুজুর চান হুকুম করুন, এনে দিচ্ছি। কাল, পরশু, তিসরা দিন,—যবে হুজুরের মর্জি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া রতনলাল বলিল, "চিড়িয়াটাকে জাল ফেলে ধ'রে আনবার একবার চেষ্টা দেখি। জালে ধরা না পড়লে তখন তোমাকে পাঠাব।"

আবদুর রহমান বলিল, "ঠিক আছে হুজুর। আমার পল্টন তৈয়ার আছে; হুজুর হুকুম দিলেই কুচ করব।"

পঁচিশ টাকার একটা চিরকুট লিখিয়া আবদুর রহমানের হাতে দিয়া রতনলাল বলিল, "খাজাঞ্চি বাবুর কাছ থেকে আপাতত এটা নিয়ে যেয়ো।"

আবদুর রহমান বুঝিল চিরকুটে অর্থের যে সংখ্যার পরোয়ানা

আছে, তাহা পারিশ্রমিকের অন্তর্গত নহে; তাহা তাহার নিয়োগমূল্য। নত হইয়া রতনলালকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া সে প্রস্থান করিল।

কথা জলধর্মী বস্তু; জল যেমন অবলীলার সহিত আপন ভারে আপনি গড়ায়, কথাও তেমনি গড়ায়। এ কথাও গড়াইতে গড়াইতে দিন দুই পরে বধূ সুরভির কানে পৌঁছিল।

চার বৎসর হইল রতনলালের সহিত সুরভির বিবাহ হইয়াছে। সুরভি ম্যাট্রিক পাশ করা দরিদ্র ভদ্র বংশের মেয়ে। রতনলালের সহিত সুন্দরী সুরূপা কন্যার বিবাহ দিতে পিতা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল না; সাত হাজার টাকা মূল্য দিয়া রতনলাল প্রিয়নাথের অনিচ্ছা কিনিয়া লইয়াছিল।

রতনলালের পক্ষ হইতে সুরভির সহিত বিবাহ প্রস্তাব যখন উপস্থিত হয়, তখন সুরভির বড় বোন করবীর বিবাহজনিত ঋণ সুদে-আসলে এবং মামলার খরচায় হাজার সাতেক টাকায় স্ফীত হইয়া প্রিয়নাথের ভদ্রাসন বাড়ি পর্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ডিক্রি হইয়া গিয়াছে; দুর্নিবার নিলাম আসন্ন। সংসার-তরণীর তলাইয়া যাইবার এই মহাদুর্দিনে সুরভির বিবাহের প্রস্তাব প্রিয়নাথের ভাল লাগে নাই। এক কন্যার বিবাহের ঋণের ফলে বিশ হাত জলের তলায় যাইতে হইয়াছে; আবার, অপর-এক কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া আরো-এক বিশ হাত জলের তলায় তলাইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত' তলানো যায় না; তলাইবার জন্য গলায় বাঁধিবার ভার চাই। সে নূতন ঋণভার পাওয়া যাইবে কোন্ বাজারে?···কোন্ মহাজনের কাছে? তাহা ছাড়া, রতনলাল অতিশয় ধনশালী এবং খানিকটা শিক্ষিত হইলেও চৌধুরী-বংশের অপযশও এ বিবাহ-প্রস্তাবে অনিচ্ছার খানিকটা হেতু ছিল। রতনলালের পক্ষ হইতে বিবাহ প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল রতনলালের বিশ্বস্ত ও চতুর কর্মচারী যশোদানন্দন সেন।

সে শুধু প্রিয়নাথের নিকট হইতে অসম্মতি লইয়াই ফিরিল না, গ্রামে দু-চার ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়া অসম্মতির কারণ জানিয়াও গেল।

দিন দশেক পরে যশোদানন্দন পুনরায় প্রিয়নাথের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া প্রিয়নাথ ভ্রুকুঞ্চিত করিল।

সে ভ্রুকুঞ্চন যশোদার দৃষ্টি এড়াইল না; মনে মনে ঈষৎ পুলকিত হইয়া সে বলিল, "বিশ্বনাথ বাবুর কাছ থেকে আপনার নামে একটা চিঠি এনেছি।"

তেমনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "কে বিশ্বনাথবাবু?"

"আপনার খুলনা কোর্টের উকিল। তিনি আমাদেরও উকিল।"

"কি লিখেছেন তিনি?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া বুক পকেট হইতে বাহির করিয়া যশোদা প্রিয়নাথের হাতে বিশ্বনাথের চিঠি দিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে এক সময়ে প্রিয়নাথের চক্ষুর কুঞ্চন অল্প অল্প অপসৃত হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ উকিল জানাইয়াছে প্রিয়নাথের বিরুদ্ধে বন্ধকী ডিক্রির টাকা পাই-পয়সা শোধ হইয়া গিয়াছে। টাকা দিয়াছে চালতাকাটির জমিদার রতনলাল চৌধুরী, কিন্তু আদালতে বিশ্বনাথ ঐ টাকা রতনলালের নির্দেশক্রমে নগদে জমা করিয়াছে প্রিয়নাথের পক্ষ হইতে। সুতরাং প্রিয়নাথের যে সম্পত্তি ডিক্রিদার কৈলাস সাহার করাল গ্রাসে প্রায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা এখন দায়মুক্ত হইয়া প্রিয়নাথের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। চিঠির শেষে বিশ্বনাথ লিখিয়াছে, আপনি অতিশয় সজ্জন, বিধাতা আপনার প্রতি যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি যৎপরোনাস্তি সুখী। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য বিধাতা তাহা হইলে আছেন।

চিঠি শেষ করিয়া বিরক্তিতিক্ত কণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিল, "এ কাজ রতন বাবু কেন করলেন?"

একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া যশোদা বলিল, "বোধহয় নিশ্চিন্ত আবহাওয়ার ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে গিয়ে গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করতে চান্।"

"তা হ'লে কি তাঁর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে?"

চকিত হইয়া যশোদা বলিল, "না, না, তাঁর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেবার কোনো দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। তিনি আমাকে বিশেষ ক'রে সে কথা ব'লে দিয়েছেন। আপনি আপনার মনোমত পাত্রেই কন্যার বিয়ে দেবেন।"

"তা হ'লে সাত হাজার টাকার কি ব্যবস্থা হবে?"

"ওটা আপনার কাছে কর্জর মতো থাকবে; সুখ-সুবিধে মতো যখন হয় পরিশোধ করবেন।"

"কিন্তু কখনো যদি সুখ-সুবিধে না হয়?"

যশোদানন্দন হাসিতে লাগিল; বলিল, "সে কথাও আমার মনিব আমাকে ব'লে দিয়েছেন। তা হ'লে তিনি মনে করবেন, গত জন্মে ও টাকাটা তিনি আপনার কাছে ধারতেন; এ জন্মে পরিশোধ হ'ল।"

খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।" বলিয়া বিশ্বনাথের চিঠিখানা লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

শেষ পর্যন্ত রতনলালের সহিত সুরভির বিবাহ হইয়া গেল।

করবীর বিবাহের যে ঋণের দরুণ সমস্ত পরিবার পথে বসিতে চলিয়াছিল, বিবাহের পূর্বে রতনলাল সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়া বিবাহকালে একটা অনুদ্বিগ্ন আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করায় ভবিষ্য স্বামীর প্রতি সুরভির কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

সুতরাং, হৃষ্ট স্বচ্ছন্দচিত্তে একটা সুমিষ্ট ভালবাসা বহন করিয়া সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল।

প্রথমে কিছুদিন রতনলালকে তাহার ভালই লাগিয়াছিল। সঙ্গীতরসিক কান্তিমান্ সদালাপী মানুষ, দরিদ্রের প্রতি মুক্তহস্ত, সহৃদয় বন্ধু। কিন্তু পরিচয় নিবিড় হইতে আরম্ভ করার সহিত সে তাহার মধ্যে দুইটা গুরু দোষের সন্ধান পাইল। প্রথমতঃ, রতনলাল অতিশয় নির্দয় শত্রু; বৈরনির্যাতনে তাহার মায়া নাই, দয়া নাই, ক্ষমা নাই, তিতিক্ষা নাই; শত্রুকে পীড়ন করার মধ্যে সে উৎকট উল্লাস উপভোগ করে। এবং দ্বিতীয়তঃ, সে অতিশয় নারীলোলুপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। এ পর্যন্ত দুশ্চরিত্রতার অপকর্ম গৃহের বাহিরে নিবদ্ধ ছিল; বিবাহের ছলে এবার তাহা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

কথাটা কানে পৌঁছিবামাত্র সুরভি রণমূর্তি ধারণ করিল। বাহিরের দুষ্কৃতি এতদিন অন্তরের মধ্যে যে বিদ্রোহাগ্নি ধূমায়িত করিতেছিল, অন্তঃপুরে সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনায় তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথম সাক্ষাতেই সে রতনলালকে ফরিয়াদ করিল; কুঞ্চিত নেত্রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "শোন। যা শুনছি, তা কি সত্যি?"

কোন্ কথার সুরভি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা বুঝিতে রতনলালের ভুল হইল না; শান্তকণ্ঠে বলিল, "যদি মিথ্যে কিছু শুনে না থাক, তা হ'লে সত্যি।"

সুরভির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল; বলিল, "কথার কসরৎ কোরোনা, স্পষ্ট ক'রে বল!"

"তা হ'লে তুমিও স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা কর।"

এক মুহূর্ত বোধহয় একটু দম লইয়া সুরভি বলিল, "একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে এ সংসারে তুমি ঢুকোতে উদ্যত হয়েছ?"

"হয়েছি।"

"তোমার দু বছর বয়সের একটা ছেলে আছে। স্ত্রী এখনো মরেনি, তবুও ?"

"হ্যাঁ, তবুও।"

"এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না ?"

"না। এর চেয়েও গর্হিত কাজ করতে আমার লজ্জা করে না, তা তুমি জানো। স্ত্রী-পুত্র থাক্তে আবার বিয়ে করা আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ আমাদের বংশে, গর্হিত কাজ নয়। এর নজির আমাদের বংশে আছে। এ বিষয়ে পৌরাণিক নজিরও আমি তোমাকে দিতে পারি। রাজা দশরথ ত' আদর্শ রাজা ছিলেন ? তাঁরও ছিল তিন রাণী।"

উচ্ছ্বাসের সহিত সুরভি বলিল, "কিন্তু দশরথের ছেলে রামের স্ত্রী ছিল একটিই।"

"ছিল আর কোথায়!" হা হা করিয়া রতনলাল হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের চৌধুরী বংশে খুঁজলে দু-চারটে দশরথের নজির পাওয়া যাবে। কিন্তু রামচন্দ্রের একটাও পাওয়া যাবে না। আমাদের বদ অভ্যেস অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু বিনা অপরাধে স্ত্রী ত্যাগ করার মহান্ অভ্যেস আমাদের বংশে নেই।"

ঠিক এ কথার যথোচিত উত্তর সুরভি সহসা খুঁজিয়া পাইল না; এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি কিন্তু আমার সাধ্যমতো তোমাকে দশরথের আদর্শ গ্রহণ করতে বাধা দোব।"

"বাধা দেবে ?" রতনলালের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, "কি রকম বাধা দেবে, শুনি ?"

সুরভি বলিল, "আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে দুই স্ত্রীর স্বামী হ'তে দোব না।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী এ সংসারে ঢোকবার আগে শুধু তোমারই সংসার নয়, ইহ সংসারও ত্যাগ করব।"

রতনলালের ভ্রূকুঞ্চন মিলাইয়া গেল।

"আত্মহত্যা করবে?"

"করব।...তুমি ত' প্রতিপক্ষকে নোটিস্ দিতে খুব জান,—আমিও তোমাকে নোটিস্ দিলাম।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া রতনলাল বলিল, "আত্মহত্যা যদি কর, তা হ'লে দুঃখ পাব পুরো; কারণ তোমার প্রতি আমি যত অন্যায়ই করিনা কেন, ভালবাসিও তোমাকে যথেষ্ট। কিন্তু একান্তই যদি আমাকে অত বড় দুঃখ দাও, তা হ'লে সে মেয়েটা এ বাড়িতে আসার পর দিয়ো, আগে নয়।"

"কেন?"

"চাবুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দিয়ে তোমার দু পা টেপাব।"

গভীর বিস্ময়ে সুরভি বলিল, "কেন?—কি এমন অপরাধ করেছে সে?"

"সে আমাকে অতি নোংরা অপমান করেছে।"

"তোমাকে অপমান করেছে?—কেন? কিসের জন্যে?"

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া রতনলাল বলিল, "এক হাজার টাকা দিয়ে একটি ঘণ্টার জন্যে আমি তাকে চেয়েছিলাম, তা'তে সে শয়তানী আমাকে তার দু পায়ের জুতো দেখিয়েছিল।"

"দেখিয়েছিল!" আনন্দে সুরভির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল....; উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "সাবাশ মেয়ে ত'!....না, তা হ'লে সে আসবার আগে মরা হবে না; সে এলে তাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধ'রে তারপর যা হয় করব।"

রতনলালের দুই চক্ষে ক্রোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; উগ্র কণ্ঠে বলিল, "এ কথা দিয়ে তুমি আমাকে সেই মেয়েটারই মতো অপমান

করছ। এ সব ধাষ্টামো বরদাস্ত করবার মতো রক্ত আমার দেহে নেই তা তুমি নিশ্চয় জানো।"

অবিচলিত কণ্ঠে সুরভি উত্তর দিল, "তুমিও জেনে রাখ, মেয়েদের প্রতি তোমার জঘন্য অত্যাচার বরদাস্ত করবার মতো রক্ত আমার দেহেও নেই। বরদাস্ত যদি আমাকে না করতে পার, রইলাম দাঁড়িয়ে, নিয়ে এস তোমার চাবুক।"

এ কথার উত্তরে কিছু করাও যেমন শক্ত, কিছু বলাও তেমনি কঠিন। "আচ্ছা, যথাসময়ে দেখা যাবে!" বলিয়া ক্রুদ্ধপদে রতনলাল স্থানত্যাগ করিল। যাইবার সময়ে মনে মনে বলিয়া গেল, 'প্রতিষ্ঠাকে দিয়ে তোমার পা টেপাই, না, তোমাকে দিয়ে প্রতিষ্ঠার পা টেপাই, সেইটেই যথাসময়ে দেখা যাবে!

এ ঘটনার দিন তিনেক পরে যশোদানন্দন হরিহর বাঁড়ুজ্জের সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে ঝিঙ্গুরখোলার অভিমুখে রওনা হইল। কিন্তু অবিলম্বেই চালতাকাটির পথে প্রত্যাবর্তন করিল; সঙ্গে লইয়া শুধু অসম্মতি এবং অসম্মানই নহে, বেশ-খানিকটা অপমানও।

বিস্তীর্ণ জমি-জমা ও সুপ্রচুর নগদ অর্থের প্রলোভন, অন্যথায় কবির আহমদ জনিত নানাপ্রকার ভয়-ভীতি দেখাইয়াও যখন রতনলালের সহিত প্রতিষ্ঠার বিবাহে হরিহরকে রাজি করিতে পারিল না, তখন নিষ্ফলতার দংশনে পীড়িত হইয়া যশোদা বলিয়াছিল, "তা হ'লে বাঁড়ুজ্জে মশায়, আপনার অদৃষ্টে দেখছি কবির আহমদের শ্বশুর হওয়াই নিতান্ত নাচছে।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, "শ্বশুর হওয়াই বা বলি কেমন ক'রে,- উপশ্বশুর হওয়া।"

অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা কান পাতিয়া পিতা ও যশোদা-

নন্দনের কথোপকথন শুনিতেছিল ; হরিহর কোনো কথা বলিবার পূর্বে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিয়াছিল, "যে ঘটনা ঘটবার আপনি ভয় দেখাচ্ছেন সেন মশায়, তা ঘটবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নিতান্তই যদি তেমন ঘটনা ঘটে, তা হ'লে তার দ্বারা মহতের আঁস্তাকুড়ে যাওয়াই হবে, ইতরের অট্টালিকায় যাওয়া হবে না।"

"নাঃ! গালিগালাজ যখন আরম্ভ হ'ল তখন আর বসা চলে না।" বলিয়া যশোদানন্দন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "এতটা দর্প ভাল নয় মা লক্ষী, অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, হয়ত শেষ পর্যন্ত ঐ ইতরের অট্টালিকাতেই আপনাকে আশ্রয় নিতে হবে। আপনার কটুবাক্যের কাছে বাঁড়ুজ্জে মশায়ের ভদ্রবাক্য তলিয়ে গেছে। কাজে-কাজেই, ফিরে গিয়ে আপনার কটুবাক্যের কথাই রতনলালবাবুকে জানাব।"

উত্তরে প্রতিষ্ঠা বলিয়াছিল, "জানাবেন বইকি। কিন্তু আপনি অন্যায় রাগ করছেন সেন মশায়,—ইতরকে ইতর বললে গালি-গালাজ হয় না। ভদ্রকথা বলতে আমিও জানি, কিন্তু ভদ্র না হ'লে ভদ্র কথা বলি কি ক'রে বলুন? যে কদর্য প্রস্তাব কলকাতায় আপনার রতনলালবাবু আমার কাছে করেছিলেন, তা আপনার জানা থাকলে আপনি কখনই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এখানে আসতেন না।...আপনারও ত বোন আছে, মেয়ে আছে, সংসার আছে।"

এ কথার উত্তরে কোনো কথা না বলিয়া শুধু বাম হাতের পাতাটা উল্টাইয়া দিয়া যশোদানন্দন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

চৌদ্দ

মাঘ মাসের প্রারম্ভ।

হরিহরের সহিত প্রতিষ্ঠার ইসমাইলপুরের জমিদার গৃহে প্রথমবার যাইবার পর প্রায় মাস দুই অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সুলতানকে লইয়া কবির আহমদ বার দুই ঝিঙ্গুর-খোলায় প্রতিষ্ঠাদের বাড়ি বেড়াইয়া গিয়াছে, এবং প্রতিষ্ঠাও একবার ইসমাইলপুরে পাল্টা সাক্ষাৎ দিয়া আসিয়াছে। সেই সুযোগে সুলতান তাহাকে নিজের স্টুডিয়োয় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বন্দিনী করিয়া রাখিয়া চারকোল দিয়া তাহার প্রস্তাবিত আলেখ্যের কঙ্কালরেখা আঁকিয়া লইয়াছে।

এদিকে, মানব-সমিতির অবস্থা যৎপরোনাস্তি সন্তোষজনক। ইসমাইলপুরের আনুকূল্যের টান লাভ করিয়া তাহার রথের চাকা মসৃণ গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। উৎসাহের ক্লান্তি নাই প্রতিষ্ঠার,—দিকে দিকে সে সভা করিতেছে, এবং দলে দলে সদস্য নাম লিখাইতেছে।

জীবনযাত্রার যন্ত্র সুচারুভাবেই চলিয়াছিল, হঠাৎ একটা পিন বিগড়াইয়া গিয়া একদিন রাত্রে একটা বিপর্যয় দেখা দিল।

কয়েকদিন হইতে এমন প্রখর শীত পড়িয়াছে যে, সমস্ত ঝিঙ্গুর-খোলা গ্রাম যেন অসাড় হইয়া কুঁকড়াইয়া গিয়াছে। রাত দশটার পর পথে শেয়াল কুকুর দেখা যায় না; এমন কি, ঝিঁঝি পোকাগুলাও যেন ডানা গুটাইয়া শক্ত হইয়া ডাক বন্ধ করিয়াছে। মানুষের ত কথাই নাই। রাত্রি নয়টার মধ্যে আহারাদি সারিয়া সে যথাশক্তি বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে গুটিসুটি মারিয়া দুরন্ত শীতকে

অভিসম্পাত দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে, আর ঘুমের মধ্যেও সেই শীতক্লিশিত রাত্রির প্রভাত হইবার সুস্বপ্ন দেখে।

রাত্রি বারোটা। হরিহর বাঁড়ুজ্জে, শৈলনন্দিনী, প্রতিষ্ঠা এবং অরবিন্দ যে ঘরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সেই ঘরের দ্বারে সজোরে করাঘাত পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্ত স্খলিত কণ্ঠের ডাক শুনা গেল, "কর্ত্তা, শীগ্‌গির দোর খুলুন!"

করাঘাতের শব্দে চারজনেরই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লেপ ফেলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া হরিহর বলিল, "কে রে? বিন্‌দে নাকি?"

যে ব্যক্তি বজ্রমুষ্টিতে গৃহ-পরিচারক বিনোদের হাত ধরিয়া ছোরা উঁচাইয়া ছিল, সে কানে কানে বলিল, "বল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি বিপদ! রান্নাঘরে আগুন লেগেছে।"

বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি বিপদ! রান্নাঘরে আগুন লেগেছে!"

"সে কি!" বলিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া হরিহর হুড়কা খুলিয়া বাহিরে আসিল, এবং তাহার পিছনে পিছনে বাকি তিনজনও।

নিমেষের মধ্যে এক ব্যক্তি উন্মুক্ত ছোরা লইয়া কক্ষের দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

অনির্বাণ টর্চের আলোকে বারান্দা ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল। সেই স্তিমিত আলোকে আট-দশ ব্যক্তিকে বন্দুক ও বল্লম উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সভীতি কণ্ঠে হরিহর বলিল, "এ কি! তোমরা কারা?"

দলের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, "আমরা, বাঁড়ুজ্জে মশায়, রতন চৌধুরী হুজুরের বরকন্দাজ; প্রতিষ্ঠা মাকে নিয়ে যাবার জন্যে ফুল দিয়ে সাজানো ডুলি নিয়ে আমরা এসেছি। লতা-ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো বজরা তাঁর জন্যে নৌকা-ঘাটে অপেক্ষা করছে। জোর

ক'রে কোন ফল নেই, তাতে অনর্থক প্রাণহানি হ'তে পারে। আমরা তাঁকে নিয়ে যাবই। চারটে বন্দুক আমাদের সঙ্গে আছে, দুটো আওয়াজ শুনলে গ্রামের কোনো লোক লেপ ছেড়ে বার হবে না।"

দলের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল। প্রতিষ্ঠার কাছে আগাইয়া গিয়া সে বলিল, "উঠোনে ডুলি রয়েছে, উঠবেন চলুন।"

হরিহর একবার উছলিয়া উঠিল, একবার বদ্ধ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সভয়ে তাহাকে জড়-নিশ্চল হইয়া যাইতে হইল। বল্লমধারী এক ব্যক্তি অরবিন্দের প্রতি বল্লম উচাইয়া বলিয়াছে, "খবরদার!"

এবার কথা কহিল প্রতিষ্ঠা। বলিল, "বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই বাবা, অনিবার্য অবস্থাকে মেনে নিতেই হবে।" তাহার পর নির্বাক-কম্পিতদেহ শৈলনন্দিনীর কাছে গিয়া বলিল, "কোনো ভয় নেই মা, কোনো শয়তানই তোমার মেয়ের কেশ-স্পর্শও করতে পারবে না।"

তাহার পর যে ব্যক্তি দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সরে দাঁড়াও, কোনো অসুবিধে হবে না তোমাদের।"

সে ব্যক্তি সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া একটা শাণিত ছোরা বস্ত্র-মধ্যে লুকাইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর হরিহর ও শৈল-নন্দিনীকে প্রণাম করিয়া, অরবিন্দর মাথায় হাত বুলাইয়া আততায়িগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চল, কোথায় তোমাদের ডুলি।"

যে ব্যক্তি বিনোদের হাত ধরিয়া ছিল, এক ঝট্কায় তাহার হাত ছাড়াইয়া প্রতিষ্ঠার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার দুই পায়ে

মাথা ঠেকাইয়া বিনোদ বলিল, "অক্ষয়কে করলে, আমাকে আশীর্বাদ ক'রে গেলে না দিদিমণি ?"

যে অশ্রু এতক্ষণ উত্তপ্ত বাষ্পাকারে সামলাইয়া ছিল, জল হইয়া তাহা বিনোদের মাথার উপর ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বিনোদের মাথার উপর এক মুহূর্ত ডান হাত রাখিয়া প্রতিষ্ঠা নীরবে আশীর্বাদ করিল ; তাহার পর আর কোনো কথা না বলিয়া পিছন দিকে আর ফিরিয়া না চাহিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠানে নামিয়া ডুলির মধ্যে গিয়া বসিল।

দলের মধ্যে এক ব্যক্তি হরিহর বাঁড়ুজ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বাঁড়ুজ্জে মশায়, নিতান্ত কাজ হাসিল করবার জন্যে আপনাদের প্রতি যেটুকু দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি অনুগ্রহ ক'রে তা ক্ষমা করবেন। আপনাদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে আমাদের মনিবের আদেশ আছে। আপনার কন্যার জন্য কোনো চিন্তার কারণ নেই, তিনি সম্মানেই থাকবেন।"

তারপর বিনোদ শুদ্ধ সকলকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে 'জয় রতন চৌধুরীর জয়' বলিয়া ডুলি লইয়া অপহর্তার দল প্রস্থান করিল। সুপরিকল্পিত ফন্দির সাহায্যে মাত্র দশ-পনের মিনিট সময়ের মধ্যে অতি পরিচ্ছন্নভাবে সুকঠিন প্রতিষ্ঠা-হরণ অনুষ্ঠানের শেষ হইল।

ঘরের মধ্যে চারজন বন্দী ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মূক হইয়া রহিল। তাহার পর চেতনা ফিরিয়া পাইয়া যখন তাহারা উপলব্ধি করিল তাহাদের অন্তরের ধন আদরের প্রতিষ্ঠা, ক্ষণকাল পূর্বেও যে নিশ্চিন্ত নিরাপদে তাহাদের সহিত একত্রে নিদ্রা যাইতেছিল, দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়া নিষ্ঠুর শীতের অন্ধকারে ক্রমশ হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহারা উন্মত্তের ন্যায় কণ্ঠের উচ্চতম পর্দায় আর্তনাদ করিতে লাগিল।

রজনীর প্রগাঢ় সুপ্তি ছিন্ন করিয়া সেই বিহ্বল আর্তনাদ

চতুষ্পার্শ্বের পল্লীবাসিগণকে চকিত উদ্বেগে জাগাইয়া তুলিল, এবং যখন তাহারা চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া শিকল খুলিয়া হরিহর প্রভৃতিকে মুক্ত করিয়া কাহিনী শুনিয়া কি করিবে, লাঠি মাত্র সম্বল করিয়া নদী-পথে ছুটিয়া গিয়া বন্দুক-বল্লমের সম্মুখীন হইয়া অনর্থক নিজেদের বিপন্ন করিবে, অথবা এত বড় দুর্ভাগ্যের মধ্যে গ্রামের লক্ষ্মীসদৃশী মেয়েকে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ছাড়িয়া দিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না,—ঠিক সেই সময়ে ধলেশ্বরের উপকূলে প্রতিষ্ঠার ডুলি অতি সন্তর্পণে সী-ব্লু মোটারলঞ্চে উঠিতেছিল।

ডুলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা দেখিল নিকটে দাঁড়াইয়া কবির আহমদ মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

গভীর বিস্ময়ে প্রতিষ্ঠা বলিল, "একি ব্যাপার দাদা! আপনি এখানে?"

হাসিমুখে কবির বলিল, "আমি এখানে না থেকে রতন চৌধুরী থাকলে খুসী হ'তে কি তুমি?"

"কিন্তু সেই পাপিষ্ঠর লোকজনই ত' আমাকে হরণ ক'রে এনেছে?"

মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে কবির বলিল, "সে পাপিষ্ঠর লোকজন নয়, এই পাপিষ্ঠরই লোকজন তোমাকে সেই পাপিষ্ঠর নাম ক'রে, হরণ করে আনেনি, খাতির ক'রে এনেছে। যে ডুলিতে তুমি এসেছ, সে ডুলি আমার বাগানের তাজা ফুল দিয়ে সুলতান নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্য করনি?"

ঈষৎ কুপিত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "যত ফুল দিয়েই ডুলি সাজান হোক না কেন, একে খাতির ক'রে আনা বলে না। বাবাকে প্রাণহানির ভয় দেখিয়ে, অরবিন্দর দিকে বল্লম উঁচিয়ে ধ'রে আমাকে নিয়ে আসাকে হরণ ক'রে আনাই বলব।"

কবির বলিল, "অবুঝ হোয়ো না প্রতিষ্ঠা। অমন ক'রে ভয় দেখিয়ে না এনে যুক্তি দেখিয়ে আন্‌তে চাইলে তুমি কি আসতে?

ছু-মাস আগেও ত তোমাদের যুক্তি দেখিয়েছিলাম। তুমিও রাজি হওনি, তোমার বাবাও রাজি হননি।”

“কিন্তু এত কাণ্ড করবার দরকার কি ছিল?”

কবির বলিল, “এ প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি, আপাতত তোমাকে জানাই, যে কাণ্ড করলাম, সে কাণ্ড করবার উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে আমার হুকুমনামা আছে। তোমাকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতে আমি প্রতিশ্রুত। এই দেখ সে হুকুমনামা।” বলিয়া দুই মাস পূর্বের চিত্তনাথের লিখিত চিঠিখানা প্রতিষ্ঠার হাতে দিল।

খামের উপর অতি পরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিত তাহার নাম ও ঠিকানা দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, “কি লেখা আছে এ চিঠিতে?”

“তা'ত ঠিক বলতে পারিনে; তবে অনুমান করি, যে কাণ্ড আমি আজ করলাম, তেমন অবস্থাতেও আমার ওপর বিশ্বাস রাখবার তোমার প্রতি উপদেশ আছে। চল, ঐ আলোটার তলায় ব'সে পড়বে চল।”

আলোর তলায় গিয়া চেয়ারে বসিয়া চিঠি খুলিয়া প্রতিষ্ঠা সংক্ষিপ্ত চিঠি পড়িয়া শেষ করিল।

তখন কবির বলিল, “এইবার বলি এ কাণ্ড কেন করলাম। তোমরা ত বেশ নিশ্চিন্ত ছিলে; আমি কিন্তু, বিশেষ ক'রে চিত্তনাথের কাছে প্রতিশ্রুতির জন্য, একটুও নিশ্চিন্ত ছিলাম না। বিদেশ থেকে বন্ধু ফিরে এলে তার হাতে বহাল-তবিয়তে বন্ধুপ্রিয়াকে সঁপে দিতে হবে, এ সঙ্কল্প এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকি নি। তাই তলে তলে রতন চৌধুরীর সব খবরই রাখছিলাম। আজ সকালে পাকা খবর পাই, আজ রাত্রি দেড়টার সময়ে সে আসবে তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যেতে। তাই ঘণ্টা ছুয়েক আগে এসে তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে এলাম। অন্য শিকারীর মুখ

থেকে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া কত যে উঁচুদরের শিকার তা তোমার ধারণা নেই প্রতিষ্ঠা। যে পবিত্র চিড়িয়ার রতন চৌধুরীর দূষিত বজরায় বন্দী হবার আশঙ্কা ছিল, সেই পবিত্র চিড়িয়া আমার লঞ্চকে আলোকিত করেছে,—একি কম আনন্দের কথা! খোদা যখন মেহেরবানি করেন, তখন সব দিক গুছিয়েই করেন। রজনী দাস কাল সদলে চালতাকাটি গিয়ে রতন চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে ঝিঙ্গুরখোলায় থাকলে তার বাড়ির সামনে পাহারা রাখ্‌তে হ'ত।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কিন্তু দাদা, রতন চৌধুরীর দল আমাদের বাড়ি গিয়ে আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে মনে ক'রে মা, বাবা আর অরুর ওপর ত' ভীষণ অত্যাচার করবে!"

কবির বলিল, "সেই জন্যেই ত ঘাটে লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। রতন চৌধুরীর বজরা এলে তোমাকে ইসমাইলপুরে নিয়ে চলেছি জানান দিয়ে তবে লঞ্চ ছাড়ব।"

এই কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চচালক ওসমান এসে বললে, "হুজুর, বজরা কাছেই এসে পড়েছে। সঙ্গে একটা লম্বা ছিপও আছে।"

কবির বলিল, "শীগ্‌গির লঞ্চে স্টার্ট দাও। তারপর বজরা ঘাটের কাছে এলে তার খুব কাছাকাছি লঞ্চ ভিড়িও।"

"যো হুকুম।" বলিয়া ওসমান স্টিয়ারিঙে গিয়া বসিল।

দেখিতে দেখিতে বজরা ঘাটের কাছে আসিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওসমান বজরার অতি নিকটে গিয়া লঞ্চ ভিড়াইল।

লঞ্চের ধারে গিয়া কবির আহমদ গভীর উদাত্ত কণ্ঠে হাঁক দিল, "রতন চৌধুরী আছ না-কি বজরায়?"

বজরার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া রতন চৌধুরী বলিল, "আছি।

কি শয়তান আহমদ, লড়াই দেবার মতলব না-কি? সঙ্গে কিন্তু সাতটা বন্দুক কাছে।"

কবির উত্তর দিল, "তা থাক, লড়াই দেবার দরকার নেই। বেফায়দায় তীরে নেমে কোনো লাভ হবে না। বড় শীত, লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়। চিড়িয়া ভাগ গিয়া পাষণ্ড চৌধুরী। প্রতিষ্ঠাকে ইসমাইলপুরে নিয়ে চলেছি এই লঞ্চে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত রতন চৌধুরী নির্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "মিথ্যে ভাঁওতায় ভোলবার লোক রতন চৌধুরী নয়। স্বচক্ষে চিড়িয়া না দেখলে বিশ্বাস করছিনে।"

"তবে স্বচক্ষেই দেখ!" বলিয়া কবির আহমদ পিছন ফিরিয়া প্রতিষ্ঠাকে বলিল, "প্রতিষ্ঠা, একবার আমার পাশে এসে দাঁড়াও।"

তাহাকে লঞ্চে দেখিলে দুর্বৃত্তরা আর অকারণ তাহাদের গৃহে যাইবে না মনে করিয়া প্রতিষ্ঠা কবিরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিষ্ঠার মুখে টর্চের আলো ফেলিয়া কবির বলিল, "বিশ্বাস হ'ল?" তাহার পর টর্চ নিভাইয়া প্রতিষ্ঠাকে বলিল, "হয়েছে, যাও!"

প্রতিষ্ঠা সরিয়া যাইতে না-যাইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে 'দুম' করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় 'ইয়া আল্লাহ্' বলিয়া কবির লঞ্চের পাটাতনের উপর শুইয়া পড়িল।

ছুটিয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠা কবিরের লুণ্ঠিত মস্তক নিজ ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া মুখ নত করিয়া গভীর উদ্বেগের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় লেগেছে দাদা?"

তখনও কবির টর্চটা হাতে ধরিয়া ছিল। আঙুল দিয়া জ্বালিয়া গলার উপর আলো ফেলিল। গ্রীবার পাশ কাটিয়া গুলি গিয়াছে, এবং ক্ষতমুখ দিয়া তাজা লাল রক্ত গল্‌গল করিয়া বাহির হইতেছে।

কবিরকে ঘিরিয়া শঙ্কাকুল মুখে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের

দিকে চাহিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "রক্ত বন্ধ করবার কোনো ওষুধ আছে লঞ্চে ?"

রহমৎ বলিল, "তা'ত নেই হুজুর।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার জল আর পরিষ্কার নেকড়া নিয়ে এস। নেকড়া যদি না থাকে তা হ'লে রুমাল কিম্বা তোয়ালে।" তাহার পর কবিরের দিকে মুখ নত করিয়া বলিল, "কোনো ভয় নেই দাদা! বেশি কাটেনি, এখনি রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

ওদিকে লঞ্চ আক্রমণ করিবার জন্য বজরায় ও ছিপে মহা আস্ফালন লাগিয়া গিয়াছিল। ওসমান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, লঞ্চ কি ছেড়ে দোব হুজুর ?"

প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "ইসমাইলপুরে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাবে ?"

"আজ্ঞে হুজুর, তা পাওয়া যাবে।"

"তা হ'লে যত জোরে পার, লঞ্চ চালিয়ে চল।"

হস্তসঙ্কেতে সকলকে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়া মৃদুকণ্ঠে কবির বলিল, "তোমাকে হরণ করে আনবার দণ্ড হাতে হাতে পেলাম প্রতিষ্ঠা।"

আবেগকম্পিতকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "এমন উল্টো কথা বলতে নেই দাদা! আমাকে উদ্ধার করার দণ্ড আমিই সাঙ্ঘাতিকভাবে দিলাম!" তাহার পর মুখ নীচু করিয়া কহিল, "লক্ষ্মী দাদা, কথা কোয়ো না, চুপ ক'রে থাক।"

জল ও নেকড়া আসিয়া পড়ায় প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে ক্ষত পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে লঞ্চ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিকার লইয়া কবির আহমদের দল সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া বজরা এবং ছিপের কোলাহলের মধ্য হইতে

গোটা চার পাঁচ বন্দুক সক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল। উত্তরে লঞ্চ হইতেও চার পাঁচটা বন্দুক নদী পরিবেশের জমাট-মৌন বিদীর্ণ করিয়া সাড়া দিল।

ফট্‌ফট্‌ শব্দ করিতে করিতে কবির আহমদের সী-ব্লু মোটার লঞ্চ দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিল ইসমাইলপুরের অভিমুখে।

পনের

ইসমাইলপুরের ঘাটের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া লঞ্চ রীতি-বিরুদ্ধ ভাবে ঘন ঘন বাঁশি বাজাইতে লাগিল। একটা অমামুলি অভিযানে যাত্রা সুরু হইয়াছিল, সুতরাং সাফল্য অথবা নিষ্ফলতা, যাহা লইয়াই ফিরিয়া আসুক, প্রত্যাবর্তনের বংশিধ্বনির মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এ বংশিধ্বনি যেন আনন্দের উল্লাস নহে, সন্তাপের আর্তনাদ। লঞ্চের আরোহীদের কানে ত' সেইরকম বাজিতেছিলই, সুলতান আহমদ এবং যে দু-চার জন বিশ্বস্ত আত্মীয় ও আমলা কবিরের প্রত্যাবর্তনের জন্য জমিদার বাড়িতে জাগিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারাও উহা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল।

কবিরের আঘাতের জন্য কবিরের সম্মুখে অথবা ইসমাইলপুরে আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিশেষ কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করিতে প্রতিষ্ঠা লঞ্চের লোকজনদিগকে পূর্বেই নিষেধ করিয়া দিয়াছিল; সুলতান আহমদ সহ যে-কয়েকজন লোক বাহিরে নৌকার উপর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদেরও অপেক্ষায় প্রতিষ্ঠা লঞ্চে প্রবেশ করিবার পথের সম্মুখে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লঞ্চ নৌকায় ভিড়িলে সে বলিল, "দেখুন, কবির সাহেব সামান্য একটু চোট পেয়েছেন; সেজন্যে আমরা তাঁর সামনে কোনো রকম উদ্বেগ প্রকাশ করছিনে। আমাদের উদ্বিগ্ন হ'তে দেখলে তাঁরও উদ্বেগ হ'য়ে ক্ষতি হ'তে পারে।"

দলের মধ্যে একজন চিন্তিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের চোট পেয়েছেন?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "অস্ত্রের।"

প্রশ্নকর্তা বুঝিতে পারিল চোটটা বস্তুতঃ কোন্ অস্ত্রের দ্বারা ঘটিয়াছে, সেকথা প্রতিষ্ঠা খুলিয়া বলিতে চাহে না; সে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চুপ করিয়া গেল।

সুলতান এক ব্যক্তির পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে এক পাশে একটু ঠেলিয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "চোট্ কি খুব গুরুতর হয়েছে দিদি?—দাদা এখন আছেন কেমন?"

"ভাল আছেন। না, তেমন গুরুতর হয়নি। তুমি ভেতরে এস সুলতান।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা এক পাশে একটু সরিয়া গিয়া যেন শুধু সুলতানেরই আসিবার পথ করিয়া দিল। যাহারা সুলতানের সহিত সমবেত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের বুঝিতে ভুল হইল না, এ পথ তাহাদেরও পথ নহে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অল্প দু-চার পা আগাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া সুলতান বলিল, "কিসের চোট লেগেছে দিদি?—লাঠির?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, বুলেটের।"

বিস্ফারিত নেত্রে সুলতান বলিল, "কি ভয়ঙ্কর! বুলেটের··· কোথায় লেগেছে বুলেট?"

"গলার বাঁ পাশে।"

"রক্ত পড়ছে এখনো?"

"অল্প-অল্প পড়ছে।"

সুলতান চমকিয়া উঠিল, "পড়ছে!···তা হ'লে?"

"বন্ধ করতে হবে।" সুলতানের দুশ্চিন্তাপাংশু মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "কিন্তু উপায় কি বল ভাই? প্রতিষ্ঠা-হরণের কঠিন কাজে দাদাকে পাঠাবে, অথচ একটুও রক্ত পড়বে না, প্রতিষ্ঠার আর নিজের অক্ষত দেহ-দুই নিয়ে দাদা ফিরবেন,—এতটা কেমন ক'রে আশা করতে পার?"

সহসা ত্রস্তত্বরিত পদে প্রতিষ্ঠা সামনের দিকে ধাবিত হইল। যে আরাম-চেয়ারে সে কবির আহমদকে শুয়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া কবির উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিকটে উপস্থিত হইয়া চকিতকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "একি দাদা, উঠে দাঁড়িয়েছ কেন?"

আর্তস্মিত মুখে কবির বলিল, "কি আশ্চর্য! যেতে হবেনা?"

"হেঁটে যাবে?"

"সাঁতার কেটে যাবার সুবিধে যখন নেই, তখন হেঁটেই যেতে হবে।" বলিয়া কবির অল্প একটু হাসিল।

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, কিছুতে হাঁটা হবেনা, শুয়ে পড়। হেঁটে যেতে অবশ্য পারবে তুমি, কিন্তু অনর্থক চাড় লাগিয়ে কোনো লাভ নেই।"

"হাঁটব পায়ে, আর চাড় লাগবে গলায়?"

"তা লাগে দাদা, লাগে।...শুয়ে পড়।"

সম্মুখে সুলতান দাঁড়াইয়া ছিল। কবির বলিল, "না-হয় সুলতানে কাঁধে ভর দিয়ে যেতাম। চেয়ারে শুয়ে যেতে দেখে লোকে ভাববে একটা মেয়েকে আনতে গিয়ে কবির আহমদ একেবারে কাত! লজ্জার কথা হবে!"

মৃদুস্বরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "সুলতানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে দেখলেও লজ্জার কথা কম হবেনা।...অবুঝ হোয়োনা দাদা, শুয়ে পড়।

"অগত্যা!" বলিয়া কবির ইজিচেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রতিষ্ঠার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া সমান দৈর্ঘ্যের চারজন তাগড়া জোয়ান অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইঙ্গিত পাইয়া তাহারা কবিরের চেয়ার উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হইল। চেয়ারের এক পাশে চলিল প্রতিষ্ঠা, অপর পাশে সুলতান আহমদ।

জমিদার গৃহে পৌঁছিয়া প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে কবিরকে তাহার শয়নকক্ষে শয্যায় শুয়াইয়া দিল।

রাত তখন প্রায় দুইটা।

শয্যাতলে একটা উৎকৃষ্ট বালাপোশ ও একটা ইটালীয়ান র‍্যাগ ছিল। প্রথমে বালাপোশ দিয়া, তাহার উপর রাগ চাপাইয়া কবিরের দেহ আবৃত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "লেপ দরকার হবে ত' দাদা?"

কবির বলিল, "না।"

"মাঘ মাসের এই দুর্জয় শীত এই দুটোতেই ভাঙবে?"

"যথেষ্ট ভাঙবে। এ দুটো গায়ের কাপড়ের তলায় খোদার দেওয়া তিন নম্বর চর্বির গরম কম্বল আছে, সে কথা ভুলোনা।"

সুলতানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "দাদার গরম গরম কিছু খাওয়া দরকার। হরলিক্স আছে সুলতান?"

ঘাড় নাড়িয়া সুলতান বলিল, "আছে। ফুফু হরলিক্স খান। দুধও আছে দিদি, সন্ধ্যার সময়ে দোওয়া টাটকা দুধ।"

খুসি হইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "তার চেয়ে ভাল আর কিছু হ'তে পারে না। এই ঠাণ্ডায় চমৎকার আছে। গরম ক'রে খানিকটা আনাও না ভাই।"

নিকটে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল, সুলতান তাহাকে বলিল, "গোলাম মিঞা শীগ্‌গির খানিকটা গরম দুধ আনার ব্যবস্থা করুন।"

ত্বরিতবেগে গোলাম মিঞা যাইতে উদ্যত হইলে প্রতিষ্ঠা ডাকিল, "গোলাম মিঞা!"

পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলাম মিঞা বলিল, "বলুন বিবি সাহেব!"

"ফীডিং কাপ আছে?"

"জি, আছে।"

"তা হ'লে একটা ফীডিং কাপ ভাল ক'রে ধুয়ে আনতে ব'লে দেবেন।"

"জি, আচ্ছা।" বলিয়া গোলাম মিঞা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

কবির বলিল, "ষোল আনা পুরিয়ে দিলে প্রতিষ্ঠা।"

সকৌতূহলে প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের দাদা ?"

"আমাকে রুগী বানাবার।"

"কেন ?"

"লঞ্চ থেকে নিয়ে এলে চেয়ারে শুইয়ে, আবার দুধ খাওয়াবে ফীডিং কাপে। তাহ'লে আর বাকি রইল কোথায় বল ?"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "বেশ ত' ডাক্তার এসে যদি বলেন, তুমি রুগী নও, সহজ সুস্থ মানুষ, তখন ফীডিং কাপ না ব্যবহার করলেই হবে।"

চকিত স্বরে কবির বলিল, "ডাক্তার আসছেন না-কি ?"

"আশা ত করছি।"

সুলতানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কবির বলিল,"কে আসছেন ? কেশব বাবু ?"

সুলতান উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"আন্‌তে লোক গেছে ?"

"গেছে।"

কবিরের মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল; বলিল, "দেখ দেখি! এই প্রচণ্ড শীতে শেষ রাত্রে বুড়োমানুষকে লেপের ভেতর থেকে টেনে আনা কতখানি অন্যায়!...এ ব্যবস্থা কে করলে ?— তুই ?"

কি ভাবে উত্তর দিবে তাহাই হয়ত' সুলতান ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে উত্তর দিল প্রতিষ্ঠা; বলিল, "আমি করেছি দাদা। গুলি তোমার না লেগে আমার লাগলে তুমিও নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থাই করতে। বুড়োমানুষের সকালবেলা ঘুম ভাঙা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থেকে অপেক্ষা করতে পারতে কি ?"

বিমূঢ়ভাবে এক মুহূর্ত প্রতিষ্ঠার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কবির বলিল, "কঠিন প্রশ্ন।"

মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "একটুও কঠিন নয়: কখনই পারতে না।" সুলতানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি কি মনে কর ভাই সুলতান!—পারতেন দাদা?"

প্রতিষ্ঠার মতই মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে সুলতান বলিল, "কখনই পারতেন না।"

দক্ষিণ হাতের চেটোটা উল্টাইয়া দিয়া কবির বলিল, "ব্যস্! হয়ে গেল! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠার দিকে চাহিয়া বলিল, "সর্বদা ত' আমার পাশে পাশে রয়েছ, এর মধ্যে ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা কখন করলে প্রতিষ্ঠা?"

উত্তর দিল সুলতান; বলিল, "বোধহয় লঞ্চে থাকতেই। লঞ্চ থেকে তোমাকে নাবাবার সময়েই খুরশেদ আমাকে জানিয়েছিল, সে চলেছে কেশব বাবুকে নিয়ে আস্‌তে প্রতিষ্ঠা দিদির আদেশে।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আদেশে নয় সুলতান, উপদেশে।"

সুলতান বলিল, "আপনার উপদেশ অনেকের পক্ষে আদেশেরই সমান।"

কবির বলিল, "প্রতিষ্ঠার অনুরোধেও কারো কারো পক্ষে আদেশের সমান নয় ত' রে সুলতান?"

এ প্রসঙ্গ আর অগ্রসর হইল না। একটা ট্রেতে এক পাত্র গরম দুধ, খানিকটা চিনি, একটা ফীডিং কাপ, একটা চামচ ও এক গ্লাস জল লইয়া একজন পরিচারক কক্ষে প্রবেশ করিল।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "ট্রেটা রাখবার একটা জায়গা চাইত সুলতান।"

অদূরে কাঠের একটা হাল্কা চতুষ্পদ ক্ষুদ্র টেবিলের উপর

ফুলদানিতে ছিল একগুচ্ছ রক্তগোলাপ। ফুলদানিটা সরাইয়া রাখিয়া সুলতান টেবিলটা আনিয়া কবিরের শয্যার পাশে রাখিল।

পরিচারকের হাত হইতে ট্রেটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "একটা তোয়ালে চাই।"

পরিচারক ছুটিয়া গিয়া একটা তোয়ালে আনিয়া প্রতিষ্ঠার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু চাই হুজুর?"

"না, আর কিছু চাইনে; এখন তুমি যেতে পার।"

অভিবাদন করিয়া পরিচারক প্রস্থান করিল।

গলা হইতে কবিরের বুক পর্যন্ত তোয়ালে দিয়া ঢাকিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠা ফীডিং কাপে দুধ ঢালিয়া বলিল, "ক চামচ চিনি দোবো দাদা?"

দক্ষিণ হস্তের দুটি আঙুল দেখাইয়া কবির বলিল, "দু-চামচ। তোমার এই দাদাটি চিনি একটু বেশি ভালবাসে।"

দুধে দুই চামচ চিনি ফেলিয়া চামচ দিয়া নাড়িয়া লইয়া কবিরের মুখের কাছে কাপ লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "নাও,—হাঁ কর।"

সবিস্ময়ে কবির বলিল, "তুমি খাইয়ে দেবে না-কি?"

"তা নয় ত' তুমি নিজে খাবে না-কি? শোয়া অবস্থায় ফীডিং কাপে নিজে খেতে গেলে দুধ গায়ে পড়বে।"

"তা হ'লে, দাও খাইয়ে।"

কয়েকবারে সমস্ত দুধটা খাওয়াইয়া শেষ করিয়া প্রতিষ্ঠা পুনরায় দ্বিতীয় পেয়ালা প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইল।

কবির জিজ্ঞাসা করিল, "ক' পেয়ালা খাওয়াবার মতলব প্রতিষ্ঠা?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "চার পেয়ালা।"

লক্ষ্ণৌ মেজাজ অতিশয় উত্তেজিত অবস্থায় ছিল বলিয়া তথায়

খানিকটা জল ব্যতীত আর কিছুই কবিরকে খাওয়াইতে পারা যায় নাই। এখন সে উত্তেজনা অনেকখানি প্রশমিত হওয়ায় পিপাসা এবং ক্ষুধা খানিকটা দেখা দিয়াছে। চার পেয়ালার প্রস্তাবে সে তেমন কিছু আপত্তি করিল না।

তৃতীয় পেয়ালা খাওয়াইয়া প্রতিষ্ঠা চতুর্থ পেয়ালায় দুধ ঢালিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে দূরে পাল্কী-বেহারাদের মিলিত কণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি শোনা গেল।

সুলতান বলিল, "ঐ ডাক্তার এসে গেছেন।"

কবির বলিল, "তা হ'লে, আর থাক্ প্রতিষ্ঠা, দুধ ঢেলো না।"

ফীডিং কাপে দুধ ঢালিতে ঢালিতে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কেন? পাল্কী থেকে ডাক্তার বেরোতে বেরোতে ঘরে আস্‌তে আস্‌তে অনায়াসে তোমার খাওয়া হ'য়ে যাবে।" সুলতানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "যাও ভাই সুলতান, ডাক্তার মশায়কে নিয়ে এসো।"

সুলতান প্রস্থান করিলে দুধে চিনি মিশাইয়া ফীডিং কাপটা কবিরের ওষ্ঠের নিকট ধরিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "হাঁ কর।"

কবির বলিল, "করছি। তার আগে একটা কথা বলি।"

"কি কথা?"

"যে গুলি আজ খেয়েছি তার একটা আশ্চর্য গুণের কথা।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা সে একটু পরে বোলো। ডাক্তার আসছেন, তার আগে এই দুধটুকু খাইয়ে তোমার মুখ ধুইয়ে দিতে চাই। নাও, হাঁ কর।" কয়েকবারে শেষ পেয়ালার সব দুধটুকু খাওয়াইয়া দিয়া প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "জল খাবে?"

কবির বলিল, "আর খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"গরম দুধের পর ঠাণ্ডা জল না খাওয়াই ভাল।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা জলের গ্লাসটা কবিরের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "গ্লাসে হাত ডুবিয়ে মুখটা একটু ধুয়ে নাও।"

প্রতিষ্ঠার নির্দেশমতো কবির তাহার ওষ্ঠাধর ধুইয়া তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিলে প্রতিষ্ঠা ট্রে ও তোয়ালে সরাইয়া রাখিয়া ছোট টেবিলটা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ফুলদানিটা তাহার উপর বসাইয়া দিল। তাহার পর কবিরের পাশে চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দেখলে, শেষ পেয়ালার দুধটুকুও খাওয়া হ'য়ে গেল।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া কবির বলিল, "গুলি খাওয়ার একটা আশ্চর্য গুণের কথা আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম প্রতিষ্ঠা।"

স্মিতমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কি বলত' ?"

"অনাত্মীয়তার আবরণকে চূর্ণ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে গুলির, সে কথা তুমি প্রমাণ করেছ।"

"কি ক'রে ?"

"গুলি খাওয়ার পর থেকে আমাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ ক'রে। যেটা অনেক আগে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, আর যেটা হয়ত' অনেক পরে আরম্ভ হোত, গুলি সেটাকে খুব তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দিয়েছে।"

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "ও। এই কথা ?" এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিল, "এ স্বাভাবিক। যে আপনার জন,—কোনো একটা দুর্ঘটনায় অথবা গুরুতর অসুখে সে পড়লে তার ওপর হঠাৎ মায়া বেড়ে ওঠে।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হইল না, বাহিরে পদধ্বনি শোনা গেল, এবং পর মুহূর্তে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল সুলতানের সহিত ডাক্তার কেশবচন্দ্র লাহিড়ী।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া প্রতিষ্ঠা যুক্তকরে ডাক্তারকে নমস্কার করিল।

প্রতিষ্ঠাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কেশব ডাক্তার বলিল, "আপনি উঠলেন কেন ?……বসুন।"

কবির বলিল, "এঁকে আপনি চেনেন চাচাসাহেব?"

ডাক্তার বলিল, "চিনিনে, তবে জানি। যে মহৎ কাজে উনি নেবেছেন, কে-না ওঁকে জানে। ওঁর নাম ত' হিন্দু-মুসলমানের মুখে মুখে।" তাহার পর কবিরের শয্যাপার্শ্বে চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল, "তারপর,—কি ব্যাপার বল ত বড় মিঞা? তুমিই ত চিরদিন গুলি খাওয়াও; এবার নিজে গুলি খেয়ে এলে কেমন ক'রে?"

স্মিতমুখে কবির বলিল, "খাওয়াবার মালিক একমাত্র খোদা-ই চাচাসাহেব,—তা আমার হাত দিয়েই খাওয়ান, অথবা আমার মুখ দিয়েই খাওয়ান।"

কবিরের দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিল, "এর ওপর আর কথা নেই।"

ক্ষণকাল নিবিষ্টভাবে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একটু জোরে হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়া ডাক্তার বলিল, "নাঃ, জ্বর-টর কিছু নেই। বাড়িতে থার্মোমিটার আছে?"

সুলতান বলিল, "আছে।"

"যদি গা গরম হয় থার্মোমিটার দিয়ে দেখো; আর, টেম্পারেচার এক শ-য়ে উঠলেই আমাকে খবর দিয়ো!"

প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "টেম্পারেচার উঠতে পারে না-কি?"

ডাক্তার বলিল, "তা একটু যে না পারে, তা নয়।"

ইত্যবসরে পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা গরম জল, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আবরণ উন্মোচিত করিয়া ওভারকোটের পকেট হইতে টর্চ বাহির করিয়া ভাল করিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ডাক্তার বলিল, "রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে।" তারপর স্বযত্নে এবং সন্তর্পণে ক্ষতের উপর অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং করিয়া দিল।

প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়ানো কি-রকম হবে ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার বলিল, "খাবার মামুলিই চলবে; হাল্কা পুষ্টিকর খাবার,—দুধ কিছু বেশি। ক্ষিধে ভাঙাবার জন্যে যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই।...ঘুম হয়েছিল?....লক্ষে?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "একটুও না।"

"হবার কথাও নয়। আচ্ছা, আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি; তাতে মেজাজটা স্নিগ্ধ করবে, ঘুমও হবে।"

বাহিরে যাইবার জন্য ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলে প্রতিষ্ঠা বলিল, "ডাক্তারবাবু, কলকাতা থেকে কোনো ভাল সার্জেন আনিয়ে একবার দাদাকে দেখিয়ে নিলে হয় না? অবশ্য আপনি যদি দরকার মনে করেন, তা হ'লেই।"

ডাক্তার কিছু উত্তর দিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া কবির বলিল, "না, না, প্রতিষ্ঠা, মশা মারবার জন্যে কলকাতা থেকে কামান আনাবার কোনো দরকার নেই। সে বিষয়ে চাচাসাহেবই যথেষ্ট।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "বেশ ত, চাচাসাহেব যদি সেই সিদ্ধান্তই করেন তাহ'লে কলকাতা থেকে কামান আসবে না। কিন্তু দাদা, ঘটনাক্রমে বাড়ির কর্তা যদি রোগী হন, তাহ'লে চিকিৎসা বিষয়ে তাঁকেও রোগীর মতই বিনা প্রতিবাদে চুপ ক'রে থাকতে হবে।"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিতে শুনিতে বর্ষীয়ান চিকিৎসকের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; কথা শেষ হইলে আসন গ্রহণ করিয়া সহাস্যে বলিল, "শক্ত পাল্লায় পড়েছ বড় মিঞা!"

কবির বলিল, "সেটা হাড়েহাড়ে বুঝছি চাচাসাহেব! ও আমাকে ভাল ক'রে হাসতে পর্যন্ত দিচ্ছে না।"

"কেন?"

"হাস্‌লে গলায় চাড় লেগে পাছে রক্ত ছোটে!"

একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

হাসি থামিলে কেশব ডাক্তার বলিল, "যে কথা প্রতিষ্ঠা মা তুলেছেন, তা সমীচীন ব'লেই মনে হয়। যদিও উপস্থিত যা

দেখছি তা'তে চিন্তিত হবার কিছু নেই, তবুও আমাদের দৃষ্টি ক্ষীণ, পদ্ধতি প্রাচীন ; একজন আধুনিকপন্থী চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে ভালই হয়।" সুলতান আহমদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি কি বল ছোট মিঞা ?"

সুলতান বলিল, "আমি প্রতিষ্ঠা দিদির সঙ্গে একমত।"

কবির বলিল, "সুলতানের ও মতের কিন্তু এক কাণাকড়িও দাম নেই চাচাসাহেব।"

"কেন ?"

"ও শুঁড়ির সপক্ষে মাতালের মত।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আনাইয়া কবিরকে দেখাইয়া লইবার প্রস্তাব প্রতিষ্ঠা করায় যেটুকু দায়িত্ব নিজের উপর স্বতঃ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভের অভিপ্রায়ে কেশব ডাক্তার বলিল, "আমিও কিন্তু কবির, সুলতানের দলের আর একজন মাতাল। আমারও মনে হয়, কলকাতা থেকে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার আনিয়ে তোমাকে দেখিয়ে নেওয়া সৎপরামর্শ।.... সাবধানের বিনাশ নেই।"

একমুহূর্ত চিন্তা করিয়া কবির বলিল, "বিনাশের আশঙ্কা সত্যিই আছে ব'লে মনে যদি করেন চাচাসাহেব, যম আর পুলিশের মধ্যে বাছাই করার অবস্থা সত্যিই যদি এসে থাকে, তা হ'লে আনান্ ডাক্তার।"

ঔৎসুক্যভরে প্রতিষ্ঠা বলিল, "পুলিশের কথা কেন বলছ দাদা ?"

কবির বলিল, "কি ওদের নিয়ম-কানুন ঠিক জানিনে, কিন্তু আমার ধারণা, চিকিৎসা করতে এসে ডাক্তার যদি দেখে চিকিৎসা করতে হবে বুলেটের ঘায়ের, তা হ'লে সে কথা পুলিশকে না জানানো হয়ত' তার পক্ষে অপরাধ হবে। সুতরাং, কলকাতায়

ডাক্তার ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইলপুরে দারোগা এসে হাজির হ'লে ব্যাপারটা হবে খাল কেটে কুমীর আনার মতো! তাই, বুলেটের ঘটনাটা লুকিয়ে রাখতে পারলেই ভাল। কিলোকিলি করা যাদের পেশা, কিল খেয়ে কিল চুরি করাই তাদের পদ্ধতি।"

কবিরের আশঙ্কা যে অমূলক, তাহা মনে করিবার মতো জ্ঞান প্রতিষ্ঠা অথবা সুলতান কাহারো ছিল না। কাজে-কাজেই, কোনো প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

কেশব ডাক্তার বলিল, "কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং, এমন একজন ডাক্তার আমাদের চাই, যিনি বিচক্ষণও বটে অথচ আত্মীয়ের মতো বুলেটের কথা গোপন রাখবেন।"

সহাস্যমুখে কবির বলিল, "তার মানে, কলকাতায় আর একটি চাচা খুঁজে বার করতে হবে।"

খাল কাটিয়া কুমীর আনার কথা হইতে প্রতিষ্ঠা মনে মনে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল; সহসা একটা কথা মনে পড়ায় উৎফুল্ল হইয়া সে বলিল, "এ সমস্যার একটা সমাধান বোধহয় হ'তে পারে। কলকাতায় সুধীর মুখার্জি নামে একজন ডাক্তার আছেন; তিনি একাধারে নিপুণ সার্জেন আর বিচক্ষণ ফিজিশিয়ান্। বয়স কম, তাই নাম-ডাকে হয়ত' এখনো প্রথম শ্রেণীর নন্, কিন্তু কাজে দ্বিতীয় শ্রেণীরও নন্। কলকাতায় আমার মামার বাড়ির উনি বাঁধা চিকিৎসক। আমার মেজমামা একজন ভাল ডাক্তার; তাঁর নিজের বাড়ীর যত কঠিন কেসই হোক না কেন, পরামর্শ করবার দরকার হ'লে সুধীর মুখার্জি ছাড়া আর কাউকে ডাকেন না।"

কবির বলিল, "এ ত' হ'ল একটা দিকের কথা। বুলেটের কাহিনী জানতে পারলে তিনি সে কথা গোপন রাখবেন?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি অনুরোধ করলে রাখবেন।"

"এ বিশ্বাস তোমার আছে প্রতিষ্ঠা ?

কবিরের কথায় প্রতিষ্ঠার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল ; বলিল, "সে বিশ্বাস না থাকলে এ কথা তুলি কি ক'রে ?"

তীক্ষ্ণ নেত্রে প্রতিষ্ঠার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কবির বলিল, "তা বটে।" তাহার পর কেশব ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তাহ'লে কাল সকালে আপনি সুধীর মুখার্জির নামেই চিঠি দিন চাচা সাহেব।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "কাল সকালে কেন ? দু-লাইন এখনই লিখে দিন না।"

"এত রাত্রে এখনই লিখে কি হবে ?"

"চিঠি নিয়ে রাত্রেই লোক যাবে।"

"কিসে যাবে ?"

"কেন, লঞ্চে।" কেশব ডাক্তারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "করতেই যদি হয়, বিলম্ব ক'রে কোনো লাভ আছে ডাক্তার মশায় ?"

সুন্দরী প্রশ্নকারিণীর প্রতি প্রসন্ন নেত্রে চাহিয়া কেশব ডাক্তার বলিল, "কোনো লাভ নেই। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা সূত্র হচ্ছে, Delay is dangerous।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "সুতরাং, delay ক'রে কাজ নেই ; আজ রাত্রেই লোক চ'লে যাক।"

নিরুপায়তার খেদোক্তির মতো কবিরের মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে নির্গত হইল, "ইয়া আল্লাহ !"

"সুলতান !"

ব্যগ্রভাবে প্রতিষ্ঠার নিকট আগাইয়া আসিয়া সুলতান বলিল, "দিদি ?"

"ডাক্তার মশায়কে কলম আর চিঠির কাগজ দাও ভাই।"

কলম এবং চিঠির কাগজের উল্লেখ হইতে লিখিবার বিষয়বস্তুর চিন্তাও আসিয়া পড়িল। কেশব ডাক্তার বলিল, "কলম আর চিঠির কাগজ ত' সহজেই আসবে, কিন্তু লিখব কি তাতে? কি কেসে ডাক্তারকে তলব করা হচ্ছে, তা'ত লিখতে হবে। বুলেটের কথা লিখলে ত' সেই একই সমস্যা।"

এ কথাটা প্রথমে কাহারো খেয়াল হয় নাই। খানিকটা কল্পনা-জল্পনা-আলোচনার পর অবশেষে পরামর্শ দিল প্রতিষ্ঠাই; বলিল, "ফুফুকে দেখাবার ছল ক'রে তাঁকে আনান্ ডাক্তার মশায়। তারপর, কার্যক্ষেত্রে ফুফুকে প্রথমে দেখিয়ে আসলে দেখানো হবে দাদাকে।"

কেশব ডাক্তার বলিল, "এ কিন্তু মন্দ পরামর্শ নয়।"

মাথা নাড়িল কবির; বলিল, "না চাচাসাহেব, এ পরামর্শে গলদ আছে।" প্রতিষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ফুফু যে ছলনা, আসলে যে আমি, এখানে পৌঁছে সে কথা বুঝতে ডক্টার মুখার্জির এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না; --হবে কি?"

মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না,—হবে না।"

"প্রতারণা ক'রে তাঁকে আনা হয়েছে দেখে তিনি যদি রুষ্ট হন, তা হ'লে সাপ মরবে না, অথচ লাঠি ভাঙবে।"

এক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "দায়িত্ব আমার। আমি বলছি, সাপ মরবে, অথচ লাঠি ভাঙবে না।"

"এ আশ্বাস তুমি আমাদের দিচ্ছ?"

কবিরের কথায় প্রতিষ্ঠা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "কি আশ্চর্য! এ আশ্বাস দিলাম না ত' কোন্ আশ্বাস দিলাম?"

কবিরও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা বটে। তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, ডক্টার মুখার্জির ওপর তোমার বেশ-একটু জোর খাটে।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "ডাক্তার

মশায়, আপনি দয়া ক'রে চিঠিটা লিখে ফেলুন, আমি ততক্ষণ আপনার জন্যে গরম চা-র ব্যবস্থা করি।"

মাঘ মাসের পল্লীগ্রামের হাড়-কাঁপানো শীতে গরম চা পানের আশ্বাসে বৃদ্ধ চিকিৎসকের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উৎসাহভরে বলিল, "গরম এক পেয়ালা চা পেলে খুবই আরামের হয়; তবে আপনার কষ্ট হবে।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, " 'আপনার' বলছেন ব'লে হয়ত' একটু হবে; 'তোমার' বললে কিছুই হ'ত না। অনাত্মীয়তার 'আপনার' শব্দটা কানে লাগছে।"

প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া হা-হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কেশব ডাক্তার বলিল, "বাঁচা গেল! আমারও জিভে লাগছিল, তবে সাহস পাচ্ছিলাম না। তাহ'লে এক পেয়ালার ব্যবস্থা কর মা।"

কবির বলিল, "ডাক্তারের সঙ্গে নার্সেরও এক পেয়ালার ব্যবস্থা কোরো প্রতিষ্ঠা। নার্সের অবস্থাও খুব সুবিধের নয়; রোগী গুলি খেয়েছে দেহে, নার্স খেয়েছে মনে।"

উচ্ছলিত হইয়া কেশব ডাক্তার বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তোমার জন্যেও চা কোরো মা প্রতিষ্ঠা।"

কবির পুনরায় বলিল, "বাকি রইল যে-দুজন, তাদের একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর অপর জন শুয়ে শুয়ে চা খাওয়া দেখেই গরম হবে।"

একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উঠিল।

হাসিমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যিনি, তিনি না হয় চা খেয়ে খেয়েই গরম হবেন; কিন্তু শুয়ে শুয়ে যিনি, তাঁর চা খেলে ঘুমের ব্যাঘাত হবে।"

কবির বলিল, "না খেলে তাঁর যে অন্য কোনো গুরুতর ব্যাঘাত হবে না, তা কি ক'রে জানলে তুমি? দোহাই প্রতিষ্ঠা! রোগের

চিকিৎসার জন্যে চাচাসাহেব আছেন; তুমি একটু রোগীর সেবা কোরো।"

কেশব ডাক্তারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাকে কি এক পেয়ালা চা দিতে পারি জ্যেঠামশায় ?"

মাথা নাড়িয়া কেশব ডাক্তার সহাস্যমুখে বলিল, "তা না-হয় এক পেয়ালা গরম চা দিয়ে রোগীর চিকিৎসাই কোরো।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রতিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, "একটু ফিকে ক'রে ?"

জবাব দিল কবির ; বলিল, "করুণাই যখন করছ, তখন তার মধ্যে আর হাতটান রেখো না প্রতিষ্ঠা। ঘনই কোরো।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা, তাহ'লে কিন্তু আধ পেয়ালা।" বলিয়া চায়ের ব্যবস্থার জন্য কক্ষ ত্যাগ করিল।

ঘরের মধ্যেই চিঠির কাগজ ও কলম ছিল। চিঠি লেখা শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই একটা ট্রের উপর চার কাপ চা ও আধ পট তৈরি চা লইয়া প্রতিষ্ঠা কক্ষে প্রবেশ করিল।

ইতিপূর্বে সুলতান কেশব ডাক্তারের চেয়ারের সম্মুখে একটা ছোট তেপায় রাখিয়াছিল। চায়ের প্রথম পেয়ালা তাহার উপর রাখিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "কিছু বিস্কুট দোব কি? সামনেই আছে।"

মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, "একখানাও না। বিস্কুট খেলে এই শেষ রাত্রের চায়ের মজাটুকু নষ্ট হবে।"

"এ পেয়ালা শেষ হলে আবার আপনার পেয়ালা ভ'রে দোবো জ্যেঠামশায়।"

দ্বিতীয় পেয়ালার আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া ডাক্তার বলিল, "কল্যাণ হোক মা তোমার!"

সুলতানের হাতে দ্বিতীয় পেয়ালা দিয়া তৃতীয় পেয়ালা লইয়া প্রতিষ্ঠা কবিরের নিকট উপস্থিত হইল।

উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইয়া কবির বলিল, "আস্তে আস্তে উঠে বসি ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, না, উঠোনা !"

যেটুকু মাথা উঁচু করিয়াছিল, শুইয়া পড়িয়া বিহ্বল ভাবে কবির বলিল, "তবে খাব কেমন ক'রে ?"

"আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

পাশের টিপয় হইতে ফীডিং কাপ তুলিয়া লইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠাকে চা ঢালিতে দেখিয়া কতকটা আর্তস্বরে কবির বলিল, "কি সর্বনাশ ! ফীডিং কাপে ক'রে চা খেলে শেষ রাত্রের চায়ের মজাটুকুকে একেবারে হত্যা করা হবে ! মনে হবে মিষ্টি মিষ্টি গরম গরম কোনো ওষুধ খাচ্ছি।" ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নার্সের হাত থেকে আপনি আমাকে রক্ষে করুণ চাচা সাহেব !"

সুরচিত চায়ের উষ্ণতায় এবং মিষ্ট সৌরভে বিভোর ডাক্তার সময়োচিত রসিকতার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না ; বলিল, "মজাকে হত্যা করা হবে না বাবা, বরং আরো ঘন করাই হবে। অমন সুদর্শনা সুলক্ষণা নার্সের ফীডিং কাপে কোনো মিষ্টি মিষ্টি গরম গরম ওষুধ খেলেও মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, গরম গরম চা-ই খাচ্ছি।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর প্রতিষ্ঠার লজ্জারক্তাভ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কোরো মা ; কিন্তু যথাসময়ে যথোচিত উত্তর না দেওয়াও একটা অপরাধ। তা ছাড়া, তোমার দৌলতে আমরা যদি একটু কৌতুকের চক্‌মকানি পাই, তা'তে তোমার কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই ; চক্‌মকির অঙ্গে ইস্পাতের আঘাত লাগ্‌লে স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, কিন্তু তা'তে চক্‌মকির দেহে আগুন লাগে না।"

কবির বলিল, "তা নিশ্চয় লাগে না ; কিন্তু আমার কি ফীডিং কাপেই খেতে হবে চাচাসাহেব ?"

ডাক্তার বলিল, "তাই খাও বাবা। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের একট মন্ত্র হচ্ছে Rest is best। মা লক্ষ্মী সেই পদ্ধতিতে তোমার সেবা করছেন।"

"আল্লা না করুন, কিন্তু কখনো যদি আপনার মা লক্ষ্মী আমার মতো অক্ষম হন, তখন Rest is best মন্ত্র অনুসারে তিনি আমার হাতে ফীডিং কাপে চা খাবেন ত?"

"নিশ্চয় খাবেন।"

"কিন্তু মুসলমানের হাতে চা খেলে আপনার মা লক্ষ্মীর জাত যাবে চাচাসাহেব।"

মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, "যাবে না। আজকাল জাত আর আগেকার মতো ঠুনকো নেই, যথেষ্ট মজবুত হয়েছে। তা ছাড়া, নার্সিং করবার সময়ে নার্সদের, আর রোগের সময় রোগীদের জাত শিকেয় তোলা থাকে।"

কবির বলিল, "এ হ'ল আপনার ডাক্তারি শাস্ত্রের আর হাসপাতালের ফতোয়া।"

প্রতিষ্ঠা উত্তর দিলে, "মানুষের হাতে খেলে মানুষের জাত যায় না, এই হচ্ছে মানব-সমিতির ফতোয়া; এ কথা ত' তুমি জান দাদা,—জেনেও সময়ে সময়ে না জানার ভান কর কেন?"

উত্তর দিল ডাক্তার; সহাস্যে বলিল, "বোধহয় যাচিয়ে নেবার জন্যে।"

কবির বলিল, "আমারও তাই বোধ হয়।"

কবিরকে চা খাওয়াইয়া প্রতিষ্ঠা কেশব ডাক্তারের কাছে আসিয়া তাহার শূন্য পেয়ালা ভরিয়া দিল।

ডাক্তার বলিল, "আমি নিজেই ভ'রে নিতে পারতাম মা, কিন্তু ঘোড়া দেখে খোঁড়া হয়েছি।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

কবির বলিল, "তা আবার যে-সে ঘোড়া নয়; গলা দেখলে মনে হয় খাস আরব দেশের।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "পটে আরও এক পেয়ালার মতো চা আছে জ্যেঠামশায়। যদি বেশি হ'য়ে না যায়, তাহ'লে আরও একটু দোবো।"

মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, "এই বেশি হ'য়ে গেছে, আর না: ওটুকু তুমি নেবে।" তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি দ্বিতীয় পেয়ালা চালাচ্ছি, আর তুমি এ পর্যন্ত স্পর্শ করলে না। পেয়ালার চা ত' ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

"না, ও বেশ চলবে।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা ট্রে হইতে নিজের পেয়ালা তুলিয়া লইল।

চা পানের পর্ব শেষ হইলে প্রতিষ্ঠা বলিল, "ভাই সুলতান, এবার জ্যেঠামশায়ের চিঠিখানা কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর।"

কবির বলিল, "চাচাসাহেবের চিঠির সঙ্গে ডাক্তার সুধীর মুখার্জিকে তুমিও একখানা চিঠি লিখে দাও প্রতিষ্ঠা।"

মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "না, না,—আমার চিঠি লেখবার কোনো দরকার নেই।"

"তুমি তাঁর পরিচিত, তাই বলছিলাম। তাহ'লে না হয় চাচাসাহেবের চিঠির তলায় এক ছত্র লিখে দাও।"

সেই রকম মাথা নাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "তারও কোনো দরকার নেই।"

"তাহ'লে চাচাসাহেবই না-হয় একছত্র লিখে জানিয়ে দিন তোমার এখানে উপস্থিতির কথা।"

সহাস্যমুখে প্রতিষ্ঠা বলিল, "তারই বা কি দরকার আছে? এসে ত' দেখতেই পাবেন।"

"একটা Surprise দিতে চাও।"

"এতে Surprise এরই বা কি আছে। এমন ত' কত অপ্রত্যাশিত জায়গায় কত অপ্রত্যাশিত মানুষের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়।"

হাসিমুখে কবির বলিল, "তার দ্বারা যা হয়, তাকেই বলে Surprise।...আচ্ছা, সে না হয় যা হবার যথাসময়ে তা হবে। উপস্থিত একটা কাজ করতে পার কিন্তু তুমি।"

"কি?"

"লঞ্চ ত' যাচ্ছেই, তুমি ওতে ঝিঙ্গুরখোলা চ'লে যাও। যেতে যেতে সকাল হ'য়ে যাবে। আমার বিশ্বস্ত লোক তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেখানে অপেক্ষা করবে। রাত বারোটা থেকে তোমার স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড পীড়ন গেছে। সমস্ত সময়টা আহার নিদ্রার দ্বারা শরীরটাকে একটু চাঙ্গা ক'রে নিয়ে ফিরতি লঞ্চে না-হয় ডাক্তারের সঙ্গে একত্রে ফিরে এসো।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে থাকিয়া সহজ কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "না হয়, চার পাঁচ দিন পরে কেমন থাক জানিয়ে ডাকে একটা পোস্টকার্ড ফেলিয়ে দিয়ো। স্নায়ুর প্রচণ্ড পীড়নের পর এত তাড়াতাড়ি আমার ফিরে আসবার কি এমন দরকার আছে।"

উল্লসিত কণ্ঠে ডাক্তার বলিল, "সাবাশ! এর চেয়ে Vigorous protest আর কিছু হ'তে পারে না।"

কবির বলিল, "তুমি রাগ করছ প্রতিষ্ঠা।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "করছি। রাগের কারণ ঘটলে আমার রাগ হয়।"

"তা হ'লে না-হয় তোমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে দাও, ওরা কেউ পৌঁছে দেবে।"

"তা দিচ্ছি। এ কথায় যুক্তি আছে।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিল, "আচ্ছা বড় মিঞা, আমি বাড়ি গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি,—ইতিমধ্যে তুমি ঘুমোবার একটু চেষ্টা কর।" তাহার পর প্রতিষ্ঠার প্রতি চাহিয়া বলিল, "ওষুধ দু-রকম আসবে, ঘুমের ট্যাবলেট একটা, আর মিক্সচার দু-দাগ। কোনটা কি ভাবে খাওয়াতে হবে,—পাশের

ঘরে চল, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই।" কবিরের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কাল সকাল নটার সময়ে আস্‌ব।"

কবির বলিল. "আসবেন।"

সুলতান ডাক্তারের পাল্‌কীর ব্যবস্থা করিতে গেল। ডাক্তার এবং প্রতিষ্ঠা পাশের ঘরে গিয়া বসিল।

ঔষধ দুইটা কি ভাবে খাওয়াইতে হইবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া ডাক্তার বলিল, "মোট কথা, বিনা প্রয়োজনে ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে না, আর ঘুম ভাঙিয়ে কোনো ওষুধই খাওয়াবে না।"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "আচ্ছা।" পরমুহূর্তে বলিল, "জ্যেঠামশায়, একটা ব্যাপার আমার একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে।"

সকৌতূহলে ডাক্তার বলিল, "কি বল ত' মা?"

"আজ কবির সাহেব যে-রকম ঠাট্টা-পরিহাস করছেন, যে-রকম উপমা-টুপমা দিয়ে ফলাও ক'রে কথা কইছেন, সাধারণত এতটা উনি করেন না। এটা ঠিক যেন ওঁর নিজের চাল নয়।"

প্রসন্নমুখে ডাক্তার বলিল, "ঠিক ধরেছ মা তুমি। ওটা আমিও লক্ষ্য করেছি। স্বভাবতঃ কবির স্বল্পভাষী রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। ওর স্নায়ুর ওপর দিয়ে যে গুরুতর বিপর্যয় গেছে ওটা তারই প্রতিক্রিয়া। বল কি মা! গলার পাশে না লেগে ঐ গুলি যদি ইঞ্চি দুয়েক ওপরে অথবা নিচে লাগ্‌ত, তাহ'লে কি আর রক্ষে ছিল! কানের কাছ দিয়ে তীর যাওয়া যা বলে, এ তার চেয়েও অনেক বেশি।" এক মুহূর্ত পরে বলিল, "কবিরের ঐ ভাবটা খানিকটা কাটিয়ে দেবার জন্যেই আমি তোমাদের নিয়ে অমন ক'রে চায়ের আসর ফেঁদে বসেছিলাম। ওর জন্যে ভয় নেই,—একটা ভাল ঘুম হ'লেই ওটুকু মস্তিষ্কচাঞ্চল্য চ'লে যাবে।"

"আসলে কোনো ভয় নেই ত?"

"কিসের বলছ?—প্রাণের?"

"হ্যাঁ।"

মাথা নাড়িয়া মৃদুস্মিত মুখে ডাক্তার বলিল, "না মা, সে ভয় একেবারে নেই। তবে ভোগাবে হয়ত' দু-চার দিন। গলা জায়গা হাত-পায়ের মতো সরল নয়ত'।"

তা ভোগাক্,—জীবনের আশঙ্কা না থাকিলেই হইল। উৎকট দুর্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভের নিশ্চিন্ততার একটা হাল্কা প্রশান্তি প্রতিষ্ঠার মুখে দেখা দিল, যাহা ডাক্তারের সজাগ দৃষ্টি এড়াইল না; কিন্তু স্বভাবতঃ দেবতাভক্ত না হইয়াও মনের গোপনতম প্রদেশে যে কাজটি সে করিল, তাহার কথা একমাত্র অন্তর্যামীই জানিলেন। তাহাকে বাঁচাইবার মাশুল কবিরকে যদি জীবন দিয়া পরিশোধ করিতে হইত, তাহা হইলে জীবন হইত দুর্বহ!

সুলতান উপস্থিত হইয়া জানাইল পাল্কী প্রস্তুত আছে, এবং কাহারদের মধ্যে একজন ঔষধের জন্য অপেক্ষা করিয়া ঔষধ লইয়া আসিবে।

যাইবার জন্য ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে প্রণাম করিয়া প্রতিষ্ঠা কবিরের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিল কবির ঘুমায় নাই, চাহিয়া আছে। বলিল, "ডাক্তার বললেন, কোনো ভয় নেই তোমার।···শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

কবিরের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল; বলিল, "কথাটা ডাক্তার এখানে বললে আমিও নিশ্চিন্ত হতাম।"

"তোমাকে নিশ্চিন্ত করবার দরকার আছে মনে করলে তিনি কথাটা এখানে আড়ম্বরের সঙ্গেই বলতেন।"

"অথচ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই মনে করেছিলেন, তোমাকে নিশ্চিন্ত করবার দরকার আছে?" বলিয়া কবির উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর ঈষৎ গভীর স্বরে বলিল, "তাই ভাবি প্রতিষ্ঠা, গতজন্মে তুমি আমার কে ছিলে!"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা বলিল, "গতজন্মের অনুমানে কাজ কি দাদা? এ জন্মের সম্বন্ধও ত' কম নয়।"

কবির বলিল, "তা নয় বলেই ত' গতজন্মের অনুমান করছি।"

এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "ও দিকের টেবিল চেয়ারে ব'সে আমি বাবাকে চিঠিটা লিখে ফেলি, তুমি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

"তা করছি; তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"কি কথা?"

"আচ্ছা, সুধীর ডাক্তার তোমার অত জানা, ওকে চিঠি লিখতে কিছুতেই রাজি হ'লে না কেন?"

"কি আশ্চর্য। জানা হলেই চিঠি লিখতে হবে?"

"তা হবেনা; কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য আরো কিছু আছে কি-না, তাই ভাবছি।"

"আর কি আশ্চর্য?"

একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কবির বলিল, "আমার কৌতূহলকে ক্ষমা কোরো প্রতিষ্ঠা,—সুধীর ডাক্তার কি একটি পতঙ্গ? তোমার প্রভার? ...এতে কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই তোমার। প্রভায় আকৃষ্ট হ'য়ে পতঙ্গ আসবেই; বস্তুধর্মকে কে ঠেকাবে বল? আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হ'লে তিনটি পতঙ্গের খবর জানলাম; তার মধ্যে একটা গুবরে পোকা।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল। পর মুহূর্তে বলিল, "বল ঠিক বলেছি কি-না?"

আবার সেই উপমা! কিন্তু একটা ভারি সুপ্রযুক্ত উপমা।

প্রতিষ্ঠা বলিল, "এবার তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, বাবাকে চিঠিখানা লিখে ফেলি।"

এই উত্তর-অতিক্রান্ত উত্তরের অধিক পতঙ্গ-প্রসঙ্গের যে আর কোনো উত্তর পাওয়া যাইবে না, তাহা কবির বুঝিল; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট। বলিল, "সুলতান এলে ফুফুর ঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিতে বলি।"

টেবিলের দিকে যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠা বলিল, "আমি ফুফুর ঘরে শোব ত' তোমাকে ওষুধ খাওয়াবে, তোমার গা দেখবে, টেম্পারেচার নেবে কে ?"

প্রশ্ন করিবার রোক দেখিয়া ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে কবির বলিল, "কেন, সুলতান ?"

"শুধু সুলতানের ওপর ছেড়ে দিয়ে যদি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম, তা হ'লে দুর্ভাবনায় আধমরা বাপ-মার কাছে চ'লে গেলেই ত' ছিল ভাল।"

"তা হ'লে কে থাকবে ?—তুমি"

"হ্যাঁ, আমি।"

"একা ?"

"হ্যাঁ একা।···কিন্তু আমি একা থাকায় তোমার যদি আপত্তি থাকে, তা হ'লে এ ঘরে সুলতান থাকবে ; আমি থাক্‌ব পাশের ঘরে, দরকার পড়লে ডেকে আনবে।"

কবির বলিল, "এ কথার আমি উত্তর দোব না।"

টেবিল চেয়ারে গিয়া প্রতিষ্ঠা চিঠি লিখিতে বসিল।

ষোল

কবির আহমদকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাইতে পারা যায় নাই। কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার, নার্স, ঔষধ-পত্র সবই আসিয়াছিল, তের দিন কবির ভালই ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ চতুর্দশ দিবসে, কি কারণে বলা কঠিন, দুর্জয় সেপ্টিসিমিয়া দেখা দেয়।

জ্ঞান হারাইবার পূর্ব মুহূর্তে কবির প্রতিষ্ঠাকে বলিয়াছিল, "চললাম প্রতিষ্ঠা। রেখে গেলাম তোমাকে, সুলতানকে আর আমার যা-কিছু বিষয়-সম্পত্তি তোমাদের দুজনের জন্যে। আর রেখে গেলাম মানব-সমিতির প্রতি আমার বিরাট শুভেচ্ছা। আমাকে এখনি তোমার সমিতির সদস্য করে নাও। দেরি কোরো না।"

প্রতিষ্ঠা উত্তর দিয়াছিল, "সদস্য করবার দরকার নেই দাদা, তোমাকে আমি খাতায়-পত্রে মানব-সমিতির সর্বাধিনায়ক করে রেখেছি। শুধু তোমার সম্মতির সই করাই বাকি।"

উত্তরে কবির বলিয়াছিল "দাও, যদি সই ক'রে দিতে পারি।"

তখন কবিরের দেহের উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রি উঠিতে দুই ডিগ্রি বাকি।

মানব-সমিতির খাতা আনিয়া কবিরের হাতে কলম দিয়া প্রতিষ্ঠা সই করিবার জায়গাটা দেখাইয়া দিল; কিন্তু দেখাইয়া দিতে গিয়া খাতার পাতায় এক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

নিভন্ত হাস্যের শ্রান্ত মুখ উপরে তুলিয়া নিমেষের জন্য প্রতিষ্ঠার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া কবির কোনক্রমে লিখিয়া দিয়াছিল 'কবির আহমদ'। তাহার পর খাতার পাতা হইতে অশ্রুবিন্দুটি কম্পিত

দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগে তুলিয়া লইয়া নিজের ললাটে তিলক পরিয়াছিল।

*   *   *

তিন দিন হইল কবিরের সমাধি হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে প্রতিষ্ঠা ও সুলতান কবিরের সমাধিস্তূপে প্রদীপ জ্বালিয়া ফুল ও মালা দিয়া বারান্দায় আসিয়া পাশাপাশি বসিয়া নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল।

মৌন ভঙ্গ করিল সুলতান। বলিল, "এবার কি তুমি ঝিঙ্গুর-খোলায় চ'লে যাবে দিদি?"

প্রতিষ্ঠা বলিল, "না ভাই কোথাও আমার যাওয়া হবে না। আমাদের সর্বাধিনায়ক যে কর্তব্যের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে থেকেই তা পালন করব। তার-পর মরে গেলে, দাহই কর আর সমাধিই দাও,—যা ইচ্ছে হয় তোমাদের কোরো।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া সুলতান বলিল, "কিন্তু বছর খানেক পরে যখন চিত্তবাবু আসবেন?"

প্রতিষ্ঠা উত্তর দিল, "তখন তাঁকে এখানে আটকাবার চেষ্টাই করব।" তাহার পর বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল সুলতান, দাদার সমাধির পাশে গিয়ে একটু বসি।"

"কিন্তু এই দুর্জয় শীতে ঠাণ্ডা লাগবে যে দিদি!"

"আমার লাগবে না। তুমি একটা গায়ের কাপড় গায়ে দিয়ে এস।" বলিয়া প্রতিষ্ঠা বারান্দা হইতে নামিয়া পড়িল।

সুলতানও নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল।